পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিদিবা : অভিজ্ঞতার বাস্তব ও অন্তর্বাস্তব

অভিজ্ঞতা অর্থাৎ বিস্তৃত জীবনচর্যা থেকে আহরিত বোধ। এই বোধ বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করেই জেগে ওঠে। মানব জীবনে প্রতিদিন ছোট-বড় অনেক ঘটনা তার জীবনকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়। এই প্রত্যক্ষভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনার বাস্তব, অভিজ্ঞতার তাৎপর্য শৈল্পিক প্রতিবেদনে মূর্ত রূপ পায়। মানুষের প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন রূপে ধরা পড়ে বাস্তবের কিছু বিশেষ ঘটনা। যা অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে, অভিজ্ঞতায়, পর্যবেক্ষণে লেখকের অন্তর্দৃষ্টিতে অনন্য রূপ লাভ করে। আর এই প্রতিদিনকার বাস্তব রূপ চিত্র, চরিত্রের সমাবেশ সাহিত্যের বাস্তবে নান্দনিক ভাষ্য নিয়ে রূপান্তরিত মাত্রায় প্রকাশিত হয়। বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার কিছু বিশেষ মুহূর্ত লেখকের রচনা শক্তির নৈপুণ্যে সাহিত্যের বাস্তবে স্থান পায়। তখন আমরা নিজেদের জীবনের মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরাবিষ্কারের একটি সুযোগ পেয়ে যাই। প্রতিদিনের জীবন-যাপনে মানুষের জীবনে ছোট বড় অনেক কিছুই ঘটে থাকে। কখনও তা সাধারণ কখনও জটিল। মানুষের যাপিত জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই সাধারণত বাস্তব (real)। এই ঘটনাগুলোর তেমন কোনো গুরুত্ব হয়তো আমাদের কাছে সবসময় থাকে না। কিন্তু জীবনপ্রবাহে ঘটিত ব্যক্ত-অব্যক্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মনের মিশ্রনগুলো আমরা একবারে ভুলে যাই না। তা মানুষের মনের অবচেতন স্তরে থেকে যায় চিরদিনের জন্য। মননশীল লেখকের রচনায় আভাসে ইঙ্গিতে বাস্তবের ভিতরে একটি অন্তর্বাস্তব অন্তর্নিহিত থাকে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও। এই অন্তর্বাস্তবই বিশেষ ঘটনার, বিশেষ কালের সময় ও পরিসরের দলিল রূপে উদ্ভাসিত হয়। বিশেষভাবে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে বাস্তব জীবন যাপনের সামগ্রিক একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়। এখানে প্রকাশ পায় জীবনের জটিলতা। চরিত্রের বহিরঙ্গের জীবনচর্যা, কাজকর্ম এবং অন্তর্গত চিন্তা, চেতনা ও বোধ। লেখকের সৃষ্টি হুবহু বাস্তবের প্রতিলিপি হতে পারে না। কারণ একটি বাস্তব ঘটনা বা উপাদানকে কেন্দ্র করে মানুষের সমগ্র সত্তার, অন্তর-বাহিরের,

সর্বাত্মক উপস্থাপনাই তাঁর কাজ। এখানে চরিত্রের ব্যক্ত, অব্যক্ত সমস্ত কিছুই প্রস্ফুটিত হতে বাধ্য। তাই সূক্ষ্ম মননশীল লেখকের পক্ষে তথ্যনির্ভর বাস্তব বিশেষ মানে রাখে না। এখানে সমালোচকের মন্তব্য স্মর্তব্য–

> ''জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে সাহিত্যিক-শিল্পী স্বতশ্চলভাবে কিছু কিছু নির্বাচন করেন এবং সেইসব নির্বাচিত অনুপুঙ্খের মধ্যে আনেন নতুন বিন্যাস, নতুন প্রেক্ষিত, নতুন মূল্যমান। এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে যায় তথ্যনির্ভর বাস্তবের উপযোগিতা; বস্তুত অপরীক্ষিত জীবন কখনও শিল্পিত সত্যের আকর হতে পারে না।''[১]

কোনো সত্যকে শিল্পিত সত্যে প্রকাশ করলে তা কখনও হুবহুভাবে জীবনের প্রতিলিপি হতে পারে না। একটি তথ্যগত সত্যকে লেখক অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু রচয়িতার বিশেষ সূক্ষ্ম-সচেতন দৃষ্টির পর্যবেক্ষণ, উপস্থাপনার কৌশল তাকে অনন্যতা প্রদান করে। লেখকের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি বাস্তবকে নির্ভর করেও নিজের ভিতরের অন্তর্নিহিত কিছু ভাবকে বোঝাতে চায় যা তার উপস্থাপিত বাস্তবের চেয়েও সত্য। অর্থাৎ যা ঘটল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাই সাহিত্য নয়। জীবনের বাস্তব রূপান্তরিত হয় সাহিত্যের বাস্তবে। নিশ্চয়ই তা সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ও উপস্থাপনা কৌশলে মূর্ত রূপ লাভ করে। এবং বাস্তবের নিষ্কর্ষিত তাৎপর্যকেই লেখক গ্রহণ করেন। ঔপন্যাসিক মূলত বহির্বাস্তবের ঘটনা, বিশেষ সময়কালের জীবনজাত বাস্তবকে উপন্যাসের আধার করেন। সার্থক সাহিত্যিক বাস্তব মানুষের ব্যক্ত-অব্যক্ত, ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সামগ্রিক একটি রূপকে ধরার চেষ্টায় নিরত থাকে। কারণ ব্যক্তিজীবন আবর্তিত হয় পরিবার, সমাজ হয়ে রাষ্ট্রনৈতিক আবর্তের মধ্য দিয়ে। যেহেতু উপন্যাসে ঘটনার তাৎপর্য চরিত্রগুলোকে কেন্দ্র করে সম্প্রসারিত হয়। তাই সেখানে স্বাভাবিকভাবেই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অন্তরস্থিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে একটি গতি অব্যাহত থাকে। বাইরে সংগঠিত ঘটনাবলী মানবমনের অন্তর্নিহিত চেতনাকে আঘাত করে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অন্তঃশীলভাবে ভেতরে ভেতরে একটি চিন্তাস্রোত বয়ে চলে। উপন্যাসে চরিত্রের বহির্জগৎ ও অন্তরস্থিত জটিল চিন্তাভাবনা প্রকাশ পায়। যা উপন্যাসের ঘটনাবলীকে সংঘটিত করে। একটি উপন্যাসেও তাই বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন চরিত্রের খণ্ডিত চিন্তাচেতনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই আলাদা আলাদাভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে

ওঠে, বহুমাত্রিকতা লাভ করে। বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদিও উপন্যাস আবর্তিত হয়। নিজস্ব রচনাপদ্ধতির গুণে সচেতন লেখক একদিকে কোনো মুখ্য চরিত্রকে কেন্দ্র করে বহির্জগতের বিবৃতি দেন। এবং অন্যদিকে মনস্তত্ত্বমূলক কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করে চরিত্রের চেতনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতায় বাস্তবের ভেতরের মূল উৎকর্ষকে অনুসন্ধিৎসামূলক প্রবণতায় ব্যক্ত করেন।

সাহিত্যিক চরিত্রকে আমরা একই সঙ্গে বাইরে ভেতরে দেখি। বাইরে যে জীবনের সঙ্গে চরিত্রের অনবরত সংঘর্ষ, অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে কখনও আবার পরিস্থিতির বিপাকে বোঝাপড়া (compromise)। কিন্তু বাইরের ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন সংস্পর্শগুলোর অভিজ্ঞতা তার ভেতরে ভেতরে সূত্র তৈরি করে চলে। এভাবে একদিকে বাস্তবনির্ভর ঘটনার বিবৃতিতে আমরা প্রতিবেদনের প্রেক্ষাপট ও রচয়িতার উদ্দেশ্য নিহিত তাৎপর্য ও তীক্ষ্ণ বাস্তবচেতনার রূপটি দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য চরিত্রের বহির্জগৎকে অনুধাবন করি অন্যান্য চরিত্রের বিপ্রতীপে এবং সমান্তরালতায়। অন্যদিকে প্রতিবেদনের মধ্যে চরিত্রের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। চরিত্রের বাইরের-ভিতরের অন্তর্দ্বন্দ্বে, অন্তর্জগতের গহন কোনের চেতন-অবচেতনের মন্থনে, বহির্বাস্তবের খোলসকে ভেদ করে বেরিয়ে আসে তার অন্তর্বাস্তব।

বাস্তব এবং অন্তর্বাস্তবের সম্মিলিত অন্তর্বয়নে চরিত্রের মধ্যে মগ্নচৈতন্যের ভাব স্পষ্ট হয়। জীবনকে দেখাটা একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া প্রাত্যহিক জীবন বা বাস্তব বস্তুবিশ্বের হুবহু প্রতিরূপ হতে পারে না। বাস্তবকে যখন সাহিত্যের আধার করে শিল্পিতভাবে রূপদান করা হয়। তখন লেখকের দর্শন প্রক্রিয়ায় তাঁর উদ্দেশ্য ও ভাব সম্প্রসারণের একটি সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসামূলক প্রবণতা মিশে থাকে। পরিশীলিত ঘটনার বহির্বাস্তবের অন্তরালে চরিত্রের অবচেতন (subconcious) ও অচেতন (unconcious) মনের স্তরের সমন্বয়ে তা ঘটে থাকে। সাহিত্যিক উদ্দেশ্য নিহিতভাবে বিশেষ অভিজ্ঞতাকে, সময়ের নির্যাসকে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে ব্যক্ত করেন। তখন তার অভিব্যক্তিতে বাস্তবের শিল্পিত রূপটি যেভাবে প্রস্ফুটিত হয়; ঠিক সেভাবে তাঁর অন্তর্স্থিত অবচেতন মনের গভীর বোধটিও উঠে আসে আখ্যানের বিশ্লেষণী পাঠে। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই ঘটনার ফল কি হতে পারে, কীভাবে তার সমাধান সম্ভব, লেখকের চিন্তাচেতনায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টিতে সম্পন্ন হয় বাস্তবের ভিতরকার সেই অন্তর্বাস্তব।

'Documents of modern Literary realism' গ্রন্থে জে. জে. বিকারের মন্তব্য থেকে একটু আভাস পাওয়া যায়—

> " Realism really did constitute a freash short because it was based on a new set of assumptions about the universe. It difined that there was a reality of essences or forms which was not accessible to ordinary sense, perception, insisting instead that reality be viewed as same thing. Immediately at hand, common to ordinary human experience and open to observation."[২]

লেখকের পর্যবেক্ষণমূলক জীবন-অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস বাস্তবের উপাদান শিল্পসাহিত্যে পুনর্নির্মিত হয়। তখন তা নতুন প্রেক্ষিতে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনার প্রকাশে যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে ছাড়িয়ে যায়। আর অভিজ্ঞতাপ্রসূত বাস্তবের ভিতরে ভিতরে তার মূল তাৎপর্যটি ফুটে ওঠে। যাকে বলা যেতে পারে বাস্তবের ভিতরের অন্তর্বাস্তব। বাস্তবের উপাদানকে সম্বল করে স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম অন্তর্বাস্তব উপস্থাপনাই সচেতন শিল্পির নৈতিক উদ্দেশ্য। বাংলা সাহিত্যের একজন সচেতন লেখক, কর্মঠ বীর, স্বাধীনতা সংগ্রামী পুরোধা ব্যক্তিত্ব গোপাল হালদার তাঁর বিশিষ্ট রচনা ত্রিদিবায় তা স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির নিরলস কর্মী গোপাল হালদারের মধ্যে রয়েছে ইতিহাস-নিষ্ঠা, সমাজমনস্কতাপ্রসূত চেতনা। তাঁর রচনার মধ্যেও রয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর চিন্তাচেতনার তাৎপর্যের বহির্প্রকাশ।

'ত্রিদিবা',– অর্থাৎ তার তিনটি খণ্ড 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য রীতির উপন্যাস। এই উপন্যাসের বিশিষ্টতা তার রচনাশৈলীতে, তার ভাবে এবং উদ্দেশ্যে প্রতিফলিত। 'ত্রিদিবা' একদিকে আত্মজৈবনিক উপাদান সমৃদ্ধ উপন্যাসের দাবি রাখে। অন্যদিকে বিষয় নির্বাচনের বিশিষ্টতায় এবং উপস্থাপন পদ্ধতির জন্যও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। 'ত্রিদিবা'র রচনাশৈলী প্রসঙ্গে লেখক গোপাল হালদার একটি চিঠিতে স্বীকার করেছেন যে তাঁর ঝোঁক আসলে চেতনাপ্রবাহমূলক রচনারীতির দিকেই। উল্লেখ্য তিনি বলেছিলেন —

> ''ইচ্ছা করে আমি *stream of conciousness*-এর রীতিতে নিজের লেখাকে চালনা করিনি, খুবই আশ্চর্য কথা — অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে লিখতে লিখতে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম আমার লেখার রীতি স্বাভাবিকভাবেই (প্রায় আমার অগোচরে) চেতনা প্রবাহের পথে চলেছে। ক্রমে নিজে বুঝলাম ওটাই তার

নিজস্ব গতি — এ পথে চলতে সে চায়। এখনো বলি আমার ভাবনার মূলধারা '*stream of conciousness*'-এর পথেই চালিত হয়। এইটা আমার 'ধর্ম' বলতে পারেন, 'রোগ' বলতে পারেন। কিন্তু তার ভাবগত—।"[৩]

১৯০৯ সালে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদদ্বয় ফ্রয়েড এবং ইয়ুং মনস্তত্ত্ব সমীক্ষা তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বের প্রভাবেই সাহিত্যক্ষেত্রে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের জন্ম হল। এই ধরনের উপন্যাসে একটি মুখ্য চরিত্রকে কেন্দ্র করে বহির্জীবন অপেক্ষা মানুষের অন্তর্লোকের মানসযাত্রাই উদ্ভাসিত হয়। চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসে বহির্গত কাহিনি গৌণ হয়ে যায়। মানুষের অন্তর্লোকের ভাষ্যই মুখ্য রূপ লাভ করে। একটি কোনো বিশেষ মানব মনের চেতনা বিশেষরূপে উদ্ভাসিত হয় এই রীতির উপন্যাসে। সেখানে চরিত্রটির মানসিক অভিযাত্রার মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রগুলোকেও উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনের দর্পণে অন্যান্য চরিত্রগুলি এবং চরিত্রের চিন্তাস্রোত ও ভাবনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিষয়বস্তুগুলোও স্পষ্ট হতে থাকে। চেতনাপ্রবাহরীতি মানুষের আপাত একটি বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্ন গতিকে নির্দেশিত করে। চেতনাপ্রবাহরীতি বা 'stream of conciousness'-এর প্রয়োগ হয় প্রথম ইউরোপীয় সাহিত্যে। জেমস জয়েস, মার্শেল প্রুস্ত, ডরোথি রিচার্ডসন, ভার্জিনিয়া উলফ প্রমুখ সচেতনভাবে নিজের সাহিত্যে এই রীতিকে গ্রহণ করেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই রীতির প্রকাশ ঘটল ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলায় প্রকাশ কালের দিক দিয়ে এবং রচনাকালের দিক দিয়ে গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা'য়। বিশেষ করে 'ত্রিদিবা' ত্রয়ীর প্রথম খণ্ড 'একদা' উপন্যাসে। পরবর্তী খণ্ডগুলো 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন'-এ এই রীতিতে শৈথিল্য এসেছে। মানুষের যেমন একটি বহির্জগৎ আছে, ঠিক তেমনি অন্তর্জগৎও আছে। এই অন্তর্জগতের মানসলোকে প্রতিনিয়ত চিন্তার উদয়-বিলয় ঘটতে থাকে। তা কখনও চেতন মনে প্রভাব বিস্তার করে। কখনও আবার মনের অবচেতন স্তরের কোণের অতলে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। বহির্জগতের আবর্তের মধ্যে মনে অন্তর্লীনভাবে প্রচ্ছন্ন একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোত প্রবাহিত হয়। গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাসে চৈতন্যপ্রবাহরীতিরই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। চৈতন্যপ্রবাহরীতির কয়েকটি আঙ্গিক - যথা, আত্মকথন (Internal speech), অতীতচারিতা (Flash Back), মনতাজ (Montage), স্বগতোক্তি (Interior monologue), দিবাস্বপ্ন (Day Dream) ইত্যাদি 'একদা'য় লেখক খুব সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাসের উপজীব্য তিনটি দিন নায়ক অমিতের স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই তিনটি দিন দেখতে দেখতে অতিক্রম করেছে অসংখ্য দিনকে, বৎসরকে। লেখক প্রথমেই কালের সীমানাকে ভেঙে দিয়েছেন ব্যতিক্রম রচনা রীতির প্রয়োগ করে। তিনটি দিনে অমিতের চেতনায় উঠে এসেছে ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ এই আঠারো বৎসরের ভারতবর্ষের ক্রান্তিকালের একটি অস্থির মহাসময়। 'ত্রিদিবা'য় অমিতের একটি গতি আছে। এই গতি তার চলনে, চিন্তায়-চেতনায়। একটি শীতের সকালে অমিতের ঘুম ভাঙল, প্রতিদিনের অভ্যাসবশত তার ঘড়িটা হাতে নিতে গিয়েই মনে পড়ে গেল ঘড়িটা বিক্রী করে সে সুনীলকে টাকা দিয়েছে। ঘড়ির কথার সঙ্গে স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ইন্দ্রানীর কথা। এর সূত্র ধরেই ইন্দ্রানী বৌদির জীবনের সংঘাত আমাদের সামনে বিবৃত হয়। ইন্দ্রানী এবং অমিতের সূক্ষ্ম অনুভূতির সম্পর্কের একটু আভাসও পাঠক পেয়ে যায়। 'ত্রিদিবা'য় বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনুসঙ্গকে কেন্দ্র করে সবিতা, সুরো, সুধীরা, সুনীল, মনীশ, মোতাহের, বুলকন, কানাই হাজরা, প্রভৃতি একাধিক চরিত্র বা তাদের ঘটনা অমিতের মনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যা আসলে চেতনাপ্রবাহরীতিরই বৈশিষ্ট্য যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রের চেতনায় অন্যান্য চরিত্রের বর্ণনা সম্প্রসারিত হতে থাকে। আত্মকথন রীতি ফুটে ওঠে কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে অমিত নিজের মনেই বলে ওঠে —

> ''নিজেকে ফাঁকি দেওয়া যায় নাকি, অমিত? সমাজকে যায়, ফাঁকি দেওয়া যায় না তবু নিজেকে। কারণ, সেই তো আসল নিয়তি। '*Our character is fate, fate is our own selves.*''[৪]

অমিত সাতকড়ির প্রসঙ্গে এসে ভেবেছে, সাতকড়ির মতো লোকেরা, অমিতকে হিংসা করে। অমিত কারণ খুঁজে পায় না। তাই সে নিজেকেই বলে —

> ''হিংসা হয় সাতকড়ির হিংসা হয় অমিতকে। ওই নধর সুস্পষ্ট দেহ, গোল মাংসল গাল দুটি, সারা গায়ে যাহার চিন্তাহীনতার স্থানু আয়েশ আঁকা, সে তোমাকে হিংসা করে।''[৫]

এভাবে কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি ব্যবহারে লেখক আত্মকথন রীতির প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এই কথনগুলি নিতান্তই অমিতের অবচেতন মনের পরিবাহক নয়। এগুলো অমিতের সচেতন মনেরই স্তরকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে। এখানে তিনি চৈতন্যপ্রবাহের আঙ্গিককে ব্যবহার করলেও মূল প্রথাগত রীতির মাত্রাকে গ্রহণ

করেননি। তিনি বিষয়ের প্রয়োজনে নিজস্ব পদ্ধতিতে তাকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করেছেন। চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই চরিত্রের চিন্তায়, চেতনায়, দর্শনে লেখকের প্রতিরূপকে অনুধাবন করা যায়। তাই বিশেষত এই ধরনের উপন্যাস আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ। এই ধরনের উপন্যাসে স্মৃতিচারণার একটি রীতি লক্ষণীয় যা মূলত আত্মজীবনীতে হয়ে থাকে। এখানে কথক এবং উপন্যাসের গতি নিয়ন্ত্রক মূল নায়ক চরিত্র। লেখকের জীবনদর্শনকে নায়কের মাধ্যমেই উপস্থাপিত করা হয়। এই ধরনের উপন্যাসে চরিত্রের কথকতায়, অন্তর্জগতের ঘাত-প্রতিঘাত, ঘটনাপ্রবাহ, যুগের বিবর্তন অর্থাৎ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর সূত্রকে গেঁথে চলে নায়ক চরিত্র। 'ত্রিদিবা'-এর নায়ক অমিতের চেতনায় লেখক উদ্ভাসিত করেছেন অন্যান্য চরিত্রের জীবনের ঘটনাকে ও তাদের জীবনদর্শনকে। অমিতই সূত্রধারের মতো সমস্ত ঘটনা, পরিবেশ, চরিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে চলেছে। যা মূলত চেতনাপ্রবাহরীতিরই পরিচায়ক। এভাবে বাংলা সাহিত্যে 'ত্রিদিবা' নতুন রীতিতে, নতুন আঙ্গিকে নবতর বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্রতা লাভ করেছে। 'ত্রিদিবা'র তিনটি দিনের বাস্তব পটভূমি রাজনৈতিক আবহকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হয়েছে। যেখানে গোপাল হালদারের রাজনৈতিক জীবনদর্শনের একটি সুস্পষ্ট মতবাদ ও দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করা যায়। যেহেতু এটাতে লেখক ত্রিশের দশকের বাস্তব অভিজ্ঞতার কয়েকটি দিনের স্বাক্ষর রাখার দায় স্বীকার করেছেন। তাই এটা অবশ্যই তাঁর আত্মজীবনকে অনেকটা স্পর্শ করে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। লেখক অভিজ্ঞতা দিয়ে, কর্মতৎপরতায় এবং জীবনদর্শনে যে-সত্য উপলব্ধি করেছেন তারই স্বাক্ষর তুলে ধরার প্রয়াসে 'ত্রিদিবা' রচনা করেছিলেন।

'ত্রিদিবা' ত্রিশের দশকের উত্তাল বিভীষিকাময় পরিস্থিতির দর্পণ। তিনটি দিনের অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে দীর্ঘ কালের বাস্তব চিত্র। কিন্তু কি এই তথ্যনির্ভর সত্য জীবন-অভিজ্ঞতাকে দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। আসলে মননশীল দেশপ্রেমিক লেখকের উদ্দেশ্য ছিল অস্থির সময়ের বাস্তব চিত্র তাঁর অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে যে সত্য তাঁর কাছে উপলব্ধ হয়েছে তাকে দর্শানো। যে সত্যকে তিনি বুঝেছেন সংগ্রামী জীবন দিয়ে। স্বাধীনতার দায়বোধে সেদিন বিভিন্ন পার্টি, বিভিন্ন মতাদর্শ অবলম্বন করে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রাম ছিল বিচ্ছিন্ন। কারণ বিভিন্ন মতাদর্শের, বিভিন্ন পার্টির নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা লাভের পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সত্য। কিন্তু একই পথের যাত্রীরা নিজেদের মধ্যেই মতভেদের ফলে সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও সমালোচনা করে ক্ষুণ্ণ করে চলেছিল নিজেদের এবং দেশের

শক্তি। যার ফলে সফল হতে পারেনি বিভিন্ন সাংগঠনিক বিপ্লব। ফলস্বরূপ স্বাধীন ভারতেও যেতে হয়েছে বিপ্লবীদের জেলে। সীল করা হয়েছে বিপ্লবীদের অফিস, নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিভিন্ন পার্টিকে। এই বিচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে স্বাধীনতার পথ যে ক্ষুণ্ণ হবে লেখকের দূরদৃষ্টিতে তার আভাস পরিস্ফুট হয়েছিল। যার প্রমাণ স্বাধীন ভারত ত্রি-খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ফলে দেশ স্বাধীন হয়েও একই মাতৃভূমির সন্তানরা ভাগ করে নিয়েছিল নিজের ভূমি, জাতি, মন ও স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিন্ন অংশীদার ইতিহাসের গবেষক গোপাল হালদার মোট বারোটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এগুলি হচ্ছে 'ভূমিকা', 'নবগঙ্গা', 'জোয়ারের বেলা', 'ভাঙন', 'স্রোতের দ্বীপ', 'উজান গঙ্গা' একত্রে এই ছয়টি 'ভদ্রাসন' নামে প্রকাশিত। গোপাল হালদারের এই ছয় খণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাস সাগাধর্মী (saga) উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে বলা যায়। এখানে ইতিহাসসচেতন সমাজবিজ্ঞানী গোপাল হালদার মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মপ্রকাশ, বিকাশ এবং পরিণতির ছবি এঁকেছেন। এই খণ্ডগুলোতে চৌধুরী বংশের বংশানুক্রমিক উত্থান-পতনের কাহিনি বিবৃত। এসব মননশীল লেখকের রচনায় হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্তের জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাস। এখানে স্থান পেয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থাপনের মাধ্যমে ইংরেজের রাজত্ব বিস্তার। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা। ধর্মবিরোধ অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের দ্বন্দ্ব। সিপাহী বিদ্রোহের মতো নানা রাজনৈতিক, সামাজিক সংঘর্ষ ও বিরোধের প্রসঙ্গ। এই সমস্যাগুলির ফলে মধ্যবিত্ত জীবন কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তারই সমাজ ও জীবনের মেলবন্ধনের ইতিহাস প্রকাশিত। আরও তিনখণ্ডে বিন্যস্ত মন্বন্তর ত্রয়ী — 'পঞ্চাশের পথ', 'উনপঞ্চাশী', 'তেরশ পঞ্চাশ'। এই ত্রয়ীতে স্থান পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তরের বিভীষিকাময় করাল গ্রাসে কবলিত সময়। যেখানে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় নানা শ্রেণির মানব-মানবীর দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহ্য সর্বহারা পরিস্থিতির রূপচিত্র দেখা যায়। গোপাল হালদার এখানে সাংবাদিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৯৪২ থেকে ৪৪ এর সময়কে নিয়ে ডকুমেন্টেশনমূলক রচনা করেছিলেন। কিন্তু নিজস্ব রচনাপদ্ধতির স্টাইলে তা শুধু দুর্ভিক্ষের দিনের ডকুমেন্টেশন হয়ে ওঠেনি, মানুষের হৃদয়কে কাঁপিয়ে সেই সময়টা যেন সজীব হয়ে ওঠে। এবং তাঁর বিশিষ্ট চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসত্রয়ী 'ত্রিদিবা'। যার বিষয়বস্তু ত্রিশের দশক থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক বাতাবরণের বিবৃতি। এই বারোটি উপন্যাস বিরাট মহাসময়ের ধাবমান পটভূমিকে কেন্দ্র করে যেন ক্রমবিবর্তিত ধারাবাহিক ইতিহাসকেই ধারণ করেছে।

ত্রিশের দশকের উত্তাল সময় পরিস্থিতি ত্রিদিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। গোপাল হালদার নিজের গভীর অভিজ্ঞতায় পুঞ্জীভূত অস্থির সময়ের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত করেছেন। এটা শুধু বাস্তবের বিবরণমূলক প্রতিবেদন হয়ে ওঠেনি। বিবরণের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে লেখকের প্রতিরূপ সত্তা মুখ্য চরিত্র অমিত আত্মবিশ্লেষণী অবচেতন মনের গ্রন্থনায় অন্তর্বাস্তবের দৃশ্যসম্ভারকে চলমান গতিতে ত্বরান্বিত করে চলেছে। ত্রিদিবায় অমিতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় সর্বস্তরের মানুষের খণ্ডিত চেতনা যার মূল সূত্রকে গ্রথিত করেছে অমিত নিজের চেতন-অবচেতন মনের গহনে। ত্রিশের দশকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে অস্থির উত্তাল পরিস্থিতি। যা সেই উত্তাল সময়ে একইসঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক সংকট ও ব্যক্তির অস্তিত্ব-সংকটেরই চিহ্নস্বরূপ। কিন্তু গোপাল হালদার অবলোকন করেছিলেন কমিউনিজমের মধ্যেই মানবমুক্তির পথকে 'All roads lead to communism to humanism'। তাই তাঁর উপন্যাসের সৃষ্ট প্রতিসত্তা অমিত ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-নারী সকলের মিলিত সর্বাত্মক শক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। গোপাল হালদারের মানস চরিত্র বা প্রতিকল্প সত্তা ত্রিদিবার নায়ক অমিত। সে রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে কোনো দলকেই পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেনি। কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলনকেও নয়, বিপ্লবী সুনীলদের নকশালপন্থী গুপ্ত সন্ত্রাসের পথকেও না। কিন্তু সবার সঙ্গে কোনও না কোনোভাবে সে জড়িত। ইস্তাহার লিখে দেয় পার্টি অফিসে। নিজের ঘড়ি বিক্রি করে সাহায্য করেছে সুনীলদের। কিন্তু বিচ্ছিন্ন আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেনি। একটা সামগ্রিক শক্তির রাস্তা খোঁজার চেষ্টায় তাঁর মন করে চলেছে আত্মানুসন্ধান। ত্রিদিবার স্রষ্টা গোপাল হালদার ত্রিদিবা রচনার কারণ হিসেবে মন্তব্য করেছিলেন, যে তিনি অস্থির সময়ের কয়েকটি দিনের স্বাক্ষর রাখতে চেয়েছেন —

> ''এক একদিনের মধ্যে– অন্ততঃ আমার অভিজ্ঞতায় যে গভীর রহস্য পুঞ্জীভূত– ত্রিশের দশকের আমাদের সেই অশান্ত দিনের মধ্যে উপন্যাস না হোক, সামান্যতম কয়েকটি পাতায়ও কি তার সার্থক আভাস রাখা যায়– এক একটি দিনই যে মহাকালের এক স্বাক্ষর, আদি অন্তেরও ইঙ্গিত।''[৬]

বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সি রূপে পরিচিত গোপাল হালদার এক অনন্য ব্যক্তিসত্তা। গোপাল হালদার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা, সৎকর্মী, কর্মনিষ্ঠ মননশীল ব্যক্তিত্ব। এই মানবতাবাদী, শোষণমুক্তিকামী বিচিত্র কর্মীপুরুষ, নিজের মনন, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, চেতনা বা বলা যায়

শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তকণা দিয়ে দেশমাতৃকার ও সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের ভুবনকে সাহিত্যকর্মের মধ্যে অনন্য রূপ প্রদান করে গেছেন।

মানবতাবাদী গোপাল হালদার সমস্ত জীবনব্যাপী ব্যক্তিগত স্বার্থকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যার জন্য তাঁকে বারবার জেলে যেতে হয়েছে। তাঁর জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসে বারবার বেজে উঠেছে মানবমুক্তির বীণা। মানবমুক্তির জন্য তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'ত্রিদিবা'র তিনটি দিনের অভিজ্ঞতার সারাৎসারে সংগ্রামের জীবন্ত রূপ যা প্রত্যেকটি খণ্ডে পরিলক্ষিত। 'ত্রিদিবা' ত্রিশের দশকের অস্থির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মজৈবনিক উপাদান বিশিষ্ট রচনা। 'ত্রিদিবা' মূলত লেখকের আত্মজৈবনিক উপাদানকে ভিত্তি করে রচিত। লেখক যদিও এখানে প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেননি। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন বয়ানে এবং কোনো কোনো জায়গায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্র অমিত এবং গোপাল হালদারের অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের ভুবন একাত্ম হয়ে গেছে। 'ত্রিদিবা'কে লেখক এবং কথকের যুগ্মসত্তার আত্মকথাও বলা যেতে পারে। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত জীবনের রূপায়ণে 'ত্রিদিবা'র অমিত হয়ে উঠেছে লেখকের প্রতিকল্প সত্তা। অমিতের বয়ানে কোথাও কোথাও লেখক স্বরকে বা লেখকেরই বাস্তব জীবনকে খুব কাছাকাছি থেকে আমরা পাঠকরা আবিষ্কার করি। আবার কখনও খুব সর্ন্তপণে নিজেকে নিরপেক্ষ অবস্থানে রেখে অমিতের বয়ানে বিন্যস্ত হয় সময়ের কথকতা।

'ত্রিদিবা'য় আত্মজৈবনিক উপাদান রূপে আপাতভাবে গোপাল হালদারের বাস্তব জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা, ঘটনার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। গোপাল হালদার স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে অনেকবার জেলে গিয়েছিলেন। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা। 'ত্রিদিবা' এর অমিতের জীবনচিত্রও তো একই। তিনি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'ত্রিদিবা'র অমিত এই ছোট বড় অনেক সংগ্রামী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, 'All roads leads to communism to humanism.'

রূপনারায়ণের কূলে দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছে ১৯৩২-এ। গোপাল হালদার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছিলেন এপ্রিলের এক প্রত্যুষে (২৪ এপ্রিল, ১৯৩২) পরোয়ানা নিয়ে এসে গিয়েছিল পুলিশ। এবং তাঁর যৌবন পেয়েছিল গ্রেফতারের মাধ্যমে রাজটীকা। তাঁর দীর্ঘদিন রাজবন্দী রূপে কারাবাস হয়েছিল। 'ত্রিদিবা'য় 'একদা' উপন্যাসের শেষে– রাত্রিশেষে সবুট পদধ্বনি অমিতের দুয়ারের সম্মুখে এসে গেল

পুলিশ। এখানে অমিতের জীবনও তো পেল রাজটীকা। অমিত অনুভব করেছে –

> ''নীচের তলায় ভারী বুটের সদর্প দ্রুত শব্দ হইতেছে। বুঝি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে কে উঠিতেছে না? অমিতের চোখে পড়িল, ভোরের আলো আসিতেছে। অন্ধকার সরাইয়া নূতন দিনের বাতায়ন খুলিতেছে। ততক্ষণে সবুট পদধ্বনি দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া গেল।''[৭]

রূপনারায়ণের কূলে ২য় খণ্ড এবং একদার সমাপ্তি যেন অমিত এবং লেখকের সত্তায়, অভিজ্ঞতায়, ভাষায় ও ভাবনায় এক হয়ে উঠেছে। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়– সোমনাথ লাহিড়ী, জ্যোতি বসু, মুজফ্ফর আহমেদ– আরও অনেকের সঙ্গে গোপাল হালদারও গ্রেফতার হন। 'আর একদিনে' রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংগ্রামীদের পুলিশ নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গোপাল হালদারের পার্টি অফিস সীল করা হয়। ঠিক তেমনি অমিতের ফ্ল্যাটও সীল হয়। গোপাল হালদার ১৯৩২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় অনেকবার প্রেসিডেন্সী জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন। কিছুদিন অন্তরীনও রাখা হয় তাঁকে। 'ত্রিদিবা'র অমিতের ক্ষেত্রেও দেখি তাই। এই সময় গোপাল হালদার রচনা করেছিলেন তার এক বিশিষ্ট গল্প 'কয়েদির আকাশ' –

> ''একটুখানি আঙিনা আর একটুখানি আকাশ, দিনে ওইটুকু দেখতে পারলেই মনে হত– আমি আছি, পৃথিবী এখনো রয়েছে। অথচ এতটুকু আঙিনা আর এতটুকু আকাশ – আমার মনের সামনে তো ছিল সমস্ত কলকাতা আর সমস্ত পৃথিবী, অতীত ও ভবিষ্যৎও।''[৮]

'একদা'র অমিতও তো এই স্বপ্ন দেখেছে, সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন, মানুষের সার্বিক মুক্তির স্বপ্ন। দেশ এবং বিশ্বের সম্মেলন, অতীতকে বরণ করে নিয়ে ভবিষ্যৎ এর মুক্ত পথ আকাশ-আঙিনার স্বপ্ন দেখেছে– তাই তো ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ও চাকরি বেছে নেয়নি। নিয়েছে সমস্যাসংকুল সংগ্রামী জীবন। যা নিরলস কর্মী হিসেবে প্রত্যক্ষ রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তি তার স্রষ্টা গোপাল হালদারের জীবন অভিজ্ঞতার সত্য দলিল। আবার আরেকটি জায়গায় দেখি– মহাযুদ্ধের প্রথম রাত্রি-কে কোথায় থাকবে, স্থান নিয়ে তার স্থিরতা নেই। 'তবে এই মুক্ত আঙিনায় আমি আছি তুমি আছ।' অর্থাৎ এই সময়টায় দেশের এবং মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার বিশাল একটা সংকট ছিল। ঔপনিবেশিক পরাধীনতার গণ্ডিতে আবদ্ধ দেশ ও

দেশবাসী। কিন্তু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলছিল মুক্ত আকাশের নীচে রুদ্ধ দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার প্রাণপণ লড়াই। এখানে লেখক আশাবাদী যে দেশ, আমি এবং তুমি অর্থাৎ 'আমরা'র সম্মিলিত প্রয়াসেই মুক্তির স্বাদ লাভ করবে।

'একদা'র নায়ক অমিত ১৯৩৭ সালে জেল থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু স্বগৃহে অন্তরীণ থাকতে হল অনেকদিন। প্রায় পাঁচ মাস পরে মুক্তি পায় সে। ১৯৩৮ সালে লেখক গোপাল হালদারও জেল থেকে মুক্তি পান। তিনিও কিছুদিন অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সময়সীমায় তিনি জেলে। 'একদা' এর রচনাকাল ১৯৩৩ সাল। অমিতের জবানিতে গোপাল হালদারের অভিজ্ঞতা একই সময়ের।

গোপাল হালদার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও পার্টির ভালমন্দ যাচাই না করে কোনও পার্টিতে যোগদান করেননি। 'ত্রিদিবা'র অমিতও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকেও কোনও কিছু যাচাই না করে কোনও পার্টিতে যোগদান করেনি। অমিত এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু শৈলেন সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করেছিল। আর অমিতের স্রষ্টা গোপাল হালদার রচনা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। এই জায়গাগুলোতে লেখকের ব্যক্তিত্ব থেকে অমিতকে পৃথক করা যায় না।

ত্রিশের দশকের উত্তাল পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অস্থিরতায় একটি কর্মঠ, বুদ্ধিদীপ্ত, আত্মানুসন্ধানী তরুণ মানস নিজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার তরঙ্গে আত্মানুসন্ধান করে চলেছে। প্রকৃত মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে এবং তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে সংগ্রামী জীবনপথ বেছে নিয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' সম্পর্কে বলেছিলেন–সংগ্রাম শেষ হয় না– বিভিন্ন রূপ নিয়ে সে ছড়িয়ে পড়ে। 'ত্রিদিবা'য় একদা থেকে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে সংগ্রামী জীবনের যাত্রা 'অন্যদিন' হয়ে 'আর একদিনে' দীর্ঘ সময়সীমা পেরিয়েও, স্বাধীন ভারতে অমিত এবং তার স্রষ্টাকে যেতে হল জেলে। লেনিন বলেছিলেন, 'Jails are the universities of revolutionaries'। সত্যিই মননশীল প্রখর চেতনাসমৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য জেল তো শুধু কারারুদ্ধ অবস্থান নয়। এই জেলে বসেই অমিতের গভীর বিশ্ববীক্ষা এবং তার স্রষ্টা গোপাল হালদারের মহৎ সৃষ্টি 'ত্রিদিবা'।

লেখক তাঁর জীবনদর্শন, অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের জগৎকে 'ত্রিদিবা'য় অমিত চরিত্রের প্রতিসত্তায় উপস্থাপন করেছেন। অমিতের জীবন পরিক্রমার মাধ্যমে বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। আর ত্রিদিবায় রেখে গিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতার বাস্তব দলিল, মহাকালের স্বাক্ষর। 'ত্রিদিবা' একদিকে

লেখক এবং কথকের যুগ্মসত্তার পরিবাহক। যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাচনের সংযোগে লেখকের আত্মজৈবনিক উপাদানসম্পন্ন উপন্যাসের দাবি রাখে। অন্যদিকে এই বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।

'ত্রিদিবা'র প্রথম খণ্ড একদার পটভূমি ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের একটি দিন। একদায় রয়েছে অমিতের সত্য পথ অন্বেষণ, আত্মানুসন্ধান। 'অন্যদিনে' সে জেলে রাজবন্দীরূপে বন্দী। সেখানে নিজেকে আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হয়েছে। বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা সে কমিউনিজমে আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে। জেল থেকে বেরিয়ে এই পথে কর্মের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মানবমুক্তির সংগ্রাম। প্রকৃত জ্ঞান, অনুভূতি, অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনদৃষ্টির আশ্রয়ে কর্মের পথ পরিক্রমায় কমিউনিস্ট বন্ধুদের সহযাত্রী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯৪৮ সালের একটি দিন 'আর একদিন'-এর বিষয়বস্তু যেখানে কমিউনিজমে বিশ্বাসী, দীক্ষিত কর্মীদের নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস কমিউনিজমের পথই মানবমুক্তির পথ।

'ত্রিদিবা' একদিকে লেখকের আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক প্রতিবেদন। অন্যদিকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মহাসময়ের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অস্থির চলচ্ছবি। অমিতের তিনটি দিনের অভিজ্ঞতায়, রোমন্থনে তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে বিভিন্ন ঘটনা। বিভিন্ন চরিত্রের বাস্তব জীবন-সংগ্রামের ঘটনাবলি। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রের জীবনের ঘটনার শুধু বিবরণ দেননি লেখক অমিতের মাধ্যমে। তাদের জীবনে ভুল শুদ্ধের সমালোচনাও করেছেন। বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। 'একদা'-য় সচেতন আত্মানুসন্ধানী অমিত জীবনের সত্য অন্বেষণ করতে করতে, বিভিন্ন ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পথ ভাঙতে ভাঙতে এগিয়েছে। 'অন্যদিন'-এ বন্দীশিবিরের মহাপাঠশালায় তার অভিজ্ঞতায় পুঞ্জিত হয়েছে জীবনের মহামন্ত্র। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার সম্মিলিত পথের মহামন্ত্র আবিষ্কার করেছে অমিত। 'একদা'র জনজীবন বিচ্ছিন্ন অমিত 'অন্যদিন' তাকে পৌঁছে দিয়েছে অসংখ্য জীবনের মাঝখানে। এখানে অমিত দেখেছে চোর, নেশাখোর, সরকারি খুনি, অত্যাচারী দেশীয় অফিসার, বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদের, যারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে আত্মত্যাগ করেছে। সাম্যবাদের পথযাত্রী যুবকদের মধ্যে অমিত দেখেছে স্বচ্ছন্দ স্বার্থত্যাগ। জেল থেকে বেরিয়ে 'আর একদিন'-এ অমিত মানবমুক্তির মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়েছে। এই পথ চলার মোড়ে মোড়ে সুনীল-মনীশ, দীনু, কানাই হাজরা, বুলকণ-মোতাহের, ভূজঙ্গ সেন, শশাঙ্ক নাথ, ইন্দ্রানী-সবিতা, অণু-মঞ্জু, মীরা, বিজয়, প্রমুখ অসংখ্য মানুষের

সংস্পর্শ তাঁর অভিজ্ঞতাকে আরও দীপ্ত করে তুলেছে। 'ত্রিদিবা' আসলে ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮, এই দীর্ঘ সময়সীমার বিবর্তনের ইতিহাস। গোপাল হালদার লিখেছিলেন–

> ''জেলখানায় বসে নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতাম। এই সময় বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চৈতন্য ও অবস্থানের বিবর্তন নিয়ে নানা ভাবনা আমার মধ্যে দেখা দেয়। আমি পরবর্তীকালে যখন 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'– এই ট্রিলজি লিখি তখন নিজেকে এই বিবর্তনের এক উদাহরণ হিসাবে অবশ্যই ভেবেছিলাম।''[৯]

অবশ্যই গোপাল হালদার তাঁর প্রতিকল্পসত্তা অমিতের মধ্যে উপস্থিত থেকে বলে গেছেন বিবর্তনের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ইতিহাস। আর এই বাস্তবকে কেন্দ্র করে তাঁর আত্মসমীক্ষায় সত্যনিষ্ঠ, প্রকৃত সত্য, রাজনীতির এবং সার্বিক আন্দোলনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সুফলের মূল তাৎপর্যকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার মূল অন্তর্নিহিত পথ বিচ্ছিন্নতা নয়, সামগ্রিকতা। এই পথ সর্বজাতীয় মানুষের সম্মিলিত পথ, মানবতার পথ। যা স্বাধীনতার চেয়েও সত্য। একটি আত্মানুসন্ধানী জনবিচ্ছিন্ন যুবক বিভিন্ন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের পথকে চিনেছে। আর এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সঠিক সত্যে পৌঁছোতে আবিষ্কার করে চলেছে বাস্তবে অভিজ্ঞতা নিহিত ভিতরের সূক্ষ্ম অন্তর্বাস্তবের মূল সারসত্যকে।

ত্রিদিবার প্রেক্ষাপটে রয়েছে আত্মজৈবনিক উপাদান সমৃদ্ধ বিশিষ্টতা এবং এই উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য হিসেবে লেখকের রাজনৈতিক জীবনদর্শনই আমাদের সামনে আসে। গোপাল হালদার তাঁর প্রতিকল্প সত্তা অমিত চরিত্রকে তাঁর চিন্তাচেতনার বাহক রূপেই চিত্রিত করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক অমিয় ধরের একটি মন্তব্যকে গ্রহণ করা যায় —

> ''গোপাল হালদার মননশীল বক্তব্য সচেতন কথাসাহিত্যিক। সমাজ বিকাশের সংঘাত ও অন্বয়ের রূপরেখার মধ্যে জীবনকে তিনি স্থাপন করেছেন। ব্যক্তিচরিত্র এখানে সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের আধার মাত্র। ব্যক্তি-জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিল রহস্যের আবরণ উন্মোচন অপেক্ষা ব্যক্তি ও পরিবার জীবনের উপর সমাজ বিকাশের দ্বন্দ্ব সংঘাত যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার বিবরণ ও বিশ্লেষণের প্রতিই লেখকের পক্ষপাত।''[১০]

'ত্রিদিবা' অমিত নামের এক যুবককে কেন্দ্র করে সমাজ বিকাশেরই দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার বিবরণ ও বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন। যে-সমাজটা ছিল ব্রিটিশ অধিকৃত। ব্রিটিশ উপনিবেশের কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ত্রিশের দশকে চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বাতাবরণ। 'ত্রিদিবা'-এর স্রষ্টা গোপাল হালদার এই বিপ্লবী আন্দোলনের সাক্ষীই শুধু নন, তিনি একজন সচেতন কর্মী ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের। তাই একজন সক্রিয় কর্মীর তীব্র অভিজ্ঞতায়, রাজনৈতিক দোলাচল আবহকে কেন্দ্র করে ত্রিদিবা বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের শিল্পিত ইতিহাসের রূপ চিত্র হয়ে উঠেছে।

গোপাল হালদার যেন সেই অস্থির সময়ের কয়েকটা দিনের আভাস, স্বাক্ষর রাখতে চেয়েছিলেন সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগে। শুধু কি এই উদ্দেশ্যই ত্রিদিবায় প্রতিফলিত হয়েছে নাকি লেখকের গূঢ় অন্তশ্চেতনা আমাদের কাছে আরও কিছু বার্তা নিয়ে আসে তা-ই বিবেচ্য। ত্রিদিবার বাস্তব পরিমণ্ডলে রয়েছে রাজনৈতিক দোলাচল, সংঘাত, সংঘর্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ। স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছাত্র, যুবা, শ্রমিক, মজুর, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। একদিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব, অন্যদিকে কমিউনিজমে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। আবার দিশেহারা কিছু যুবক চরমপন্থায় বিশ্বাসী যারা উগ্র সন্ত্রাসবাদের পথকে নির্দেশ করে। তারা এই পথেই আত্মত্যাগ করতে বেরিয়ে পড়ছে ঘর ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে। এদের মতাদর্শ ভিন্ন, পথ ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য এক : স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা। এই অস্থির সময়ের ঘূর্ণাবর্তে অমিতের চোখে দেখি সমাজ ও জীবনের রূপান্তরের ইতিহাস। দেশের বিবর্তনের ধারাবিবরণী। এটা শুধু তো দেখা নয়। তাই এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে চেতনার গভীরের সুতীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতার বোধ যা বিভিন্ন ঘটনার সংশ্লেষণে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে অমিতের চিন্তা-চেতনার আবর্তে। স্বল্প সময়ের গণ্ডির মধ্যেও অভিজ্ঞতার স্তরের পর স্তর উন্মোচনে বিশাল সময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রকাশ পেয়েছে অমিতের জীবন রূপান্তরের ছবি। যে ছবিতে ফুটে উঠেছে সমাজ, দেশ, নানা জন ও জনতার ছবি এবং অমিতের জীবনচেতনার সঙ্গে সময়ের চলমান প্রতিফলনই ত্রিদিবার অভিব্যক্তি।

বাস্তব পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে অমিতের মানস পরিমণ্ডলের চেতনার দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে অভিজ্ঞতার গভীরে বাস্তবের (inner-reality) প্রতিকৃতি, তাই অন্তর্বাস্তবের রূপ নিয়েছে। ব্যক্তিগত আলোচনায় গোপাল হালদার বলেছিলেন,—

"জেলে গিয়ে মনে হচ্ছিল, যে-রাজনীতি আর আন্দোলনের ভেতর থেকে

আমাকে উপড়ে আনা হলো জেলখানার বাধ্যতামূলক বিচ্ছিন্নতায়, এখন তার অভিজ্ঞতাগুলোকে একটু যাচাই করা দরকার। আর লেখা ছাড়া তো যাচাই হয় না — উত্তপ্ত এক আবেগে, প্রায় ঘোরের মধ্যে মাত্র সাতদিনে 'একদা' উপন্যাসটি লেখা হল।"[১১]

এই যে 'যাচাই করা' এর মধ্যেই তো আমরা তার সূক্ষ্ম ভাবনাটি পেয়ে যাই। তিনি শুধু সেই উত্তপ্ত দিনের বিবৃতি দিতে বসেননি। জীবন-অভিজ্ঞতার অন্তরালে গভীর-চেতনায় উত্থিত সংশ্লেষণী পাঠ প্রস্তুত করেছেন। সেই অস্থির সময়ের একটি সমীক্ষা করেছেন আত্মনিরীক্ষণের মাধ্যমে। তাই তাঁর উপস্থাপিত প্রতিকল্প সত্তা অমিত প্রতিমুহূর্তে আত্মানুসন্ধান করে চলেছে। এই সন্ধানেরই ফাঁকে ফাঁকে লেখক আভাসে, ইঙ্গিতে মূল বাস্তবটি ভেদ করে অন্তর্বাস্তবকে স্বচ্ছতা দিয়েছেন।

ত্রিদিবায় লেখকের অভিজ্ঞতার মন্থনে উত্থিত নির্যাসকে বুঝতে হলে ব্যক্তি গোপাল হালদারের জীবনদর্শনকে বোঝা প্রয়োজন। গোপাল হালদার সমস্ত জীবন ধরে সাহিত্যে, সাধনায়, কর্মে, চিন্তায় মানুষের কাছাকাছি রয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রথমত মানবতাবাদী, তারপর তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কর্ম। সমগ্রের সাধনায় ছিলেন তিনি ব্রতী। মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন। তিনি মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আশাবাদী। চিন্তায়, কর্মে, শিল্প-সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কৃতিতে জীবনের আহরিত অভিজ্ঞতার তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। শিক্ষায়, কর্মে, ধর্মে সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় জীবনযোদ্ধা যিনি, সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত সেই তাপসের জীবনচেতনার ফসল তাঁর রচনাসম্ভার। সেখানে ফুটে ওঠে তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠ সমাজমনস্কতা। সমাজ সচেতন গোপাল হালদার কর্মে-চিন্তায় সমাজ জীবনে সর্বস্তরের মানুষের উন্নতিকল্পে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে প্রতিকূল পথ ভাঙতে ভাঙতে একসময় পৌঁছেছেন সাম্যবাদের তীর্থভূমিতে। এই তীর্থ মানবতীর্থ। তিনি মহামানবের পূজারি। তাই তাঁর জীবনদৃষ্টিতে ওঠে আসে সাধারণ, অতিসাধারণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নারী-পুরুষের অসংখ্য ছবি। কেউ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তাই তাঁর দেখা দৃষ্টিতে, সাহিত্য রচনায় ফুটে ওঠে সাধারণে-অসাধারণে সম্মিলিত প্রয়াসে মানুষের সংগ্রামের ছবি। এবং তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে গোপাল হালদারের অন্তর পুরুষকে খুঁজে পাই, আর পাই ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ইতিহাসনিষ্ঠ গোপাল হালদারকে। গোপাল হালদারের জীবনদর্শনকে গড়তে দুজন লোকের অবদান তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

> ''দু'টি বিশেষ প্রভাব আমার উপর পড়েছিল। একদিকে বিবেকানন্দের দেশ ও জনসেবার প্রেরণা আর অন্যদিকে রবীন্দ্র সাধনা। বিশেষ করে রবীন্দ্র অবদান, অর্থাৎ সামগ্রিকতার একটা বোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, সমগ্রের বৃহতের এক চেতনা। তাই স্বদেশীতেই যাই, আর সাহিত্যই করি — এই বৃহৎ বিশ্ববোধের আঙিনায় দাঁড়িয়েই তা করি।"[১২]

ত্রিদিবার তিনটি দিন 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'। এই তিনটি দিন ধারণ করেছে বৃহৎ বঙ্গের বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই দশকের ইতিহাসকে। এখানে সূত্রধার কথক ও বিশ্লেষক দ্রষ্টারূপী কেন্দ্রীয় চরিত্র অমিত। অমিতের জীবন-অভিজ্ঞতার দর্পণে দেখতে পাই আমরা প্রায় দুই দশকের স্পর্শকাতর সংগ্রামী আন্দোলনের অস্থির সময়ের কালচ্ছবি। কিন্তু অমিতের বিবৃতিতে বিশ্লেষণে শুধু সময়ের বাস্তবই দৃষ্টিগোচর হয় না। লেখক যেন অমিতের চেতনার গভীর কোণের নিভৃত মনের চিন্তায়, বিশ্লেষণে অন্য কিছুর ইঙ্গিত রেখে যেতে চেয়েছিলেন। ত্রিদিবায় আমরা দেখেছি নানা পথ এবং নানা মতের অবধারিত পথে আন্দোলন বিচ্ছিন্ন পথে চলছিল। কিন্তু লেখক গোপাল হালদারের বিশ্লেষণী দৃষ্টি সহজেই অনুভব করতে পেরেছিল এই বিচ্ছিন্নতার পরিণামকে। তিনি প্রকৃত মুক্তির পথে ব্রতী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জনগণকে। তাই সমাজের অগ্রগতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সফলতার পথে কিছু অন্তরায় তাঁর মননে, চেতনায় গভীর ছাপ ফেলেছিল। আর এই সূক্ষ্ম কারণগুলির সংশ্লেষণে, তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। সঠিক পথকে এবং প্রকৃত স্বাধীনতার স্বরূপ সন্ধানের ছবিকে বক্তব্যে স্পষ্ট করেছিলেন। ত্রিদিবায় তাই অমিতের মতো একটি চরিত্রকে অবলম্বন করতে হয়েছে। যে শুধু দ্রষ্টা নয়, নিজের জীবন-চেতনায়, কর্মে এই সংগ্রামী পথের পথিক। কিন্তু এই পথকে চিনতে, সঠিক পথের এবং মতের আত্মানুসন্ধানে তাকে নীরব অথচ গভীর ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়েছে। আর এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই একদায় দেখি অমিতের স্রষ্টা তাকে পথে নামিয়ে এনেছেন। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, সচেতনভাবে, বা নিজের অলক্ষ্যেই সে জড়িয়ে পড়ছে একের পর এক ঘটনার আবর্তে। এর ফলে তার সুযোগ হয়েছে অসংখ্য মানব-মানবীর সংস্পর্শে আসার। লেখক অমিতকে প্রথমেই কর্মীরূপে উপস্থাপন করেননি। 'একদা'য় চলেছে অমিতের সংশয় এবং সমীক্ষা। সর্বস্তরের মানুষের অন্তর্ভাবনা ও প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ। পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবন থেকে ধীরে ধীরে বন্ধনমুক্তির ঘটনা। ক্রমে এই সমীক্ষায় তার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির হয়েছে। একদার শেষে গ্রেপ্তার হওয়া এবং 'অন্যদিন'-এ জেলজীবনে

মহাপাঠশালার অঙ্গনে পদার্পণের মধ্য দিয়ে। এই জেলেই সহযাত্রী অন্যান্য বন্দীদের সংস্পর্শে, আলাপ-আলোচনায় সে নিজের পথ চিনেছে। গভীর অধ্যয়নে, সমস্ত পথ ও মতকে যাচাই করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে। অর্থাৎ মানবমুক্তির পথ অবলম্বন, আর এই পথ অমিত কমিউনিজমের মধ্যে অবলোকন করেছে। তাই তার মন আওড়ায় — 'All roads lead to communism to humanism'। এবং জেল থেকে বেরিয়ে এই মানবমুক্তির পথে অমিতের কর্মযুদ্ধ 'অন্যদিন' থেকে 'আর একদিনে' এর পরিক্রমা শুরু হয়েছে।

'ত্রিদিবা' এর মূল সুরে বিধৃত রয়েছে আত্মপরিচয় সন্ধান। এই আত্মপরিচয় ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমগ্রের সন্ধানে মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গের মধ্যেই অমিতের আত্মসমীক্ষণে বিধৃত। নিজেকে জানার তীব্র আগ্রহেই অমিত 'একদা'য় চিন্তা-চেতনায় দ্বিধা-সংশয় অতিক্রম করে 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'তে উত্তরণের প্রচেষ্টায় রত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের নিজস্ব গণ্ডি অতিক্রম করে সামূহিক জীবন প্রবাহে সে পৌঁছতে চায়। অমিত চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সমন্বয়ী জীবনভাবনা। সে বলে — 'Only in collective living do we reach plenitude.' (আর একদিন, পৃঃ ২৩৫) এই ভাবনা প্রতিনিয়ত চিন্তায়, কর্মের মধ্যে তাকে প্রাণচঞ্চল করে চলে। ছোট-বড়, মহৎ-তুচ্ছ, সমস্ত কিছুর চিন্তাস্রোতেই তার জীবনস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলে। তাই সে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য, রোমান্টিক জীবন অভীপ্সা পরিত্যাগ করে সংগ্রামী কর্মজীবনে মানবমুক্তির পথে 'বড় আমি'তে পৌঁছার পথ খুঁজে পায়। এই বোধ আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে সামগ্রিক চেতনার বোধ। তাই, 'বড় আমি' — আত্মস্থ অর্থাৎ একাত্ম আর তাই বিশ্বাত্মা।'

আর এই বিশ্বাত্মবোধের ফলে সে নিজের পরিচয়ের পর্যালোচনা করেছে শেষে —

> ''কোথায় তোমার পরিচয় অমিত? জিজ্ঞাসা করেছিলেন ব্রজেন্দ্র রায়। সে পরিচয় আর লেখায় ফুটিল না, কথায় ফুটিল না, ফুটিল না প্রেমমণ্ডিত গৃহ রচনায়; একান্তে বসিয়া আত্ম-রচনায়। জ্ঞানে চিন্তায় ভাবনায়, কাব্যে-কলায়, শিল্পে কোথাও তার কোনো পরিচয় নাই তোমার। পৃথিবীর চক্ষে তবে কি তুমি ব্যর্থ, বিক্ষিপ্ত? অথবা মানুষের এই মহদভিযানের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াই সার্থক তুমি। জীবনের এই জোয়ারের মধ্যে ডুবিয়া ভাসিয়া পাইয়াছ জীবন রসের পরম আস্বাদন। মানুষের এই মহাস্রোতে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াই

পাইয়াছ কৌতুকে আনন্দে মানব-মহারসের অকৃপণ উপলব্ধি। না, ছোট আমিতে সুখ নাই ইন্দ্রানী। তোমাতে আমাতে জানিতে হইবে — ওনলি ইন ইন্‌টেন্স লিভিং ডু উই টাচ্ ইট্যারনিটি।"[১৩]

অমিতের 'বড় আমি' জানে বৃহত্তর জনস্বার্থে জীবন উৎসর্গ করতে হয়। যেখানে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ, রোমান্টিক ভাবালুতা অতিক্রম করে কর্মের পথে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এই কর্ম পথও সঠিক চিন্তা-চেতনার পথ ধরেই আবিষ্কৃত হবে। এই পথেই সে খুঁজে পাবে নিজের 'আত্মপরিচয়'। এই পরিচয় ক্ষুদ্রের সীমাবদ্ধতায় নয়, বৃহতের অসীমতায়। অমিত নামের মধ্যেও যেন লেখক এই ইঙ্গিতটিকেই ধরিয়ে দিয়েছেন। তার পরিচয় দেশকে নিয়ে, বহুজনকে নিয়ে এগোয়। তাই আত্মসচেতন মানুষ হিসেবে অমিত সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে যেতে আগ্রহী। তার অভীপ্সিত পরিচয়ের পথ প্রশস্ত হয়ে চলে দেশের পরিচয়ের গণ্ডিকে পার করে বিশ্বপরিচয়ে ও তার কালের পরিচয়ে। কবি শঙ্খ ঘোষ ত্রিদিবা এর আলোচনায় বলেছিলেন —

''যখনই কোনো কাজের দায়ে এসে পৌঁছই আমরা, তখনই বুঝতে পারি যে, নিজেকে নিজের মধ্যে ছাড়িয়ে নেওয়াই হলো আমাদের প্রধান এক সমস্যা, কেননা সকলের সঙ্গে মিলবার পথে আমাদের অহংই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে বড় বাধা। আত্মসচেতন মানুষ বুঝতে চায় সেই বাধার পরিমাণ, অতিক্রম করতে চায় তাকে, তার আত্মপরিচয় ক্রমে বিস্তারিত হয়ে দেখা দিতে থাকে তার দেশের পরিচয়ের মধ্যে, তার কালের পরিচয়ের মধ্যে। নিজের খোলস ভেঙে মানুষের এই আত্মসচেতন বিস্তারের ইচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে আমির এই সংযোগ।"[১৪]

অমিতের পথ আত্মানুসন্ধানের পথ। এই সন্ধান একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে আত্মপরিচয় খুঁজে পায়। এই পরিচয় শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে দেশ ও কালের পরিচয়ে। এর মধ্যে যুক্ত হয়ে আসল আত্মপরিচয়ের পথ বিস্তারিত হতে থাকে। তাই তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় বাস্তব দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুকে দেখার তীব্র চেতনা ও সাহস। এই সাহসের জন্যই সে 'একদা'য় সুনীলকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য সারাদিন শহরে ঘুরে বেড়ায়। বাস্তব দৃষ্টির ফলেই এই প্রতিকূল সময়ে সুনীলের মতো গুপ্ত

সন্ত্রাসবাদীর প্রতি মমত্ববোধ ও নিজের দায়বোধ জন্ম দেয়, তাদের সহায়ে টাকা জোগাড়ের জন্য ছটফট করে, ঘড়ি বিক্রি করে টাকা দেয়। সবচেয়ে বড় নিজের জীবনের ঝুঁকি নেয়। অমিত 'একদা'য় একজন সক্রিয় সহানুভূতিশীল দ্রষ্টার ভূমিকায় রয়েছে। সঠিক কর্মক্ষেত্র সে এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই তার কর্মক্ষেত্রে সে এখনও উদ্যোগী নয়। একটি দায়বোধ (commitment) তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে তাই তার বিচরণ, ভয়কে, ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করার তাড়না। কারণ সে উপলব্ধি করে, 'This is the age of Action.' অর্থাৎ এই যুগ কর্মের যুগ। সে নির্দ্বিধায় সুনীলকে সাহায্য করতে যায়। সুনীল মণীশের মতো যুবকদের পথকে সে গ্রহণ করতে পারে না কিন্তু তাদের আত্মত্যাগকে সে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে দেখেছে। দীনু, মোতাহেরদের জন্য ইস্তাহার লিখে দিয়েছে। বুদ্ধিজীবী বাবার বন্ধু ব্রজেন রায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনায়ও সময় কাটায়। বন্ধু সুহৃদ, শৈলেন, সাতকড়িদের আত্মমগ্ন জীবনস্পৃহা তাকে ব্যথিত করে। সে যুগের দাবিকে মেটাতে চায়। এই 'যুগের দৃষ্টিই এ যুগের সৃষ্টি' এই আপ্তবাক্য তাকে তাড়িত করে। যুগের দৃষ্টিতে সে দেখে দেশ ও জনের কল্যাণে এখন সবার কর্মের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে অঙ্গীকার করতে হবে। সে অঙ্গীকার করতে চায় কিন্তু সঠিক কর্মক্ষেত্র নির্বাচনে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই তার চিন্তা-ভাবনায় হ্যামলেটীয় সংশয়ের দোলা লাগে। শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ তার মনের গ্রন্থিকে দোলায়িত করে। শেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্র হ্যামলেটের মতো সে চিন্তা করে, কারণ হ্যামলেট সংশয়ে, দ্বন্দ্বে ছিল অস্থির। যার ফলে চিন্তায় সে নিজের বোধকে যাচাই করে। সে ভাবে এই সময়ে দাঁড়িয়ে 'to be or not to be' অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিকতার বোধে উদ্বুদ্ধ অমিত বিচ্ছিন্ন সব আন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারে না। সে চায় সবার সম্মিলিত প্রয়াস। তাই তার চিন্তায় ও কর্মে একটি বিরোধ লক্ষিত হয়। অমিত চিন্তা এবং কর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বলতে চায় —

> ''চিন্তা প্রাণের ধর্ম নয়, বরং প্রাণবেগের বিরোধী। প্রাণ চায় স্ফূর্ত হতে, অর্থাৎ মূর্ত হতে। প্রাণ মূর্ত হয় একমাত্র কর্মে। যখন কর্মে তা ফুটতে পায় না, তখন কখনও কখনও সে নিজের পুঁজির খোঁজ নেয়, বুঝে দেখতে চায়, কেন ফুটতে পাচ্ছে না। তারই নাম চিন্তা।''[১৫]

'একদা'য় অমিত সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেনি কিন্তু তাই বলে তাকে নিষ্ক্রিয়ও বলা যায় না। কারণ আত্মসচেতন অমিত যুগধর্মকে অঙ্গীকার করতে চায়। কিন্তু ত্রিশের ক্রান্তিকালের একজন দ্রষ্টা

অমিত অনুভব করেছে সঠিক পথ সন্ধান করে এই আন্দোলনের পথ প্রশস্ততার কথা। সে জীবনকে তুচ্ছ করে সুনীল মণীশদের মতো যুবকদের সাহায্য করেছে। অমিত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে যৌবনের উন্মাদনায় সুনীল-মণীশদের দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই পথ অবলম্বনকারীরা সুনির্দিষ্ট সংগঠন তৈরি করেনি। তাদের মধ্যে দূরদর্শী কোনও পরিকল্পনা নেই। শুধু অর্ধউন্মাদ নেশায় নিজেকে ত্যাগ করে যাচ্ছে। তাদের আন্দোলনের পথ ছিল জনগণ-বিচ্ছিন্ন যে-বিচ্ছিন্নতার ফলে তারাও বিচ্ছিন্ন পথে হারিয়ে যাচ্ছে। অমিত এদের আত্মত্যাগকে অশ্রদ্ধা করেনি। এদের প্রতি সে সহানুভূতিশীল, কারণ তাদের লক্ষ্য দেশের মঙ্গল সাধন। এই দায়বোধে অমিত নিজের আর্থিক অসহায়ত্বকে অগ্রাহ্য করে নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় ঘড়ি বিক্রি করেও সাহায্য করে। অমিত ইতিহাসের ছাত্র। সে তাই জানে ইতিহাস ক্ষমাহীন, সে ধ্বংস করে নতুন করে আবার সৃষ্টি করার জন্য। ফলে অমিতের চোখে এই ছেলেরাও তার অভীপ্সিত লক্ষ্য পথের পথিক, তাদের আত্মত্যাগকে সে অসম্মান করতে পারে না। এই দিনগুলিতে দেশের অবস্থা তার চোখে বিধৃত —

> ''সে কি দিন!
>
> স্কুল ভাঙিয়া যাইতেছে, কলেজ টলিয়া পড়িতেছে – কিশোর ও যুবক প্রাণগুলি দিশেহারা, লক্ষ্যহারা; অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে আপনাদের তুলিয়া দিবার জন্য তাহারা অস্থির। তাহাদের মনে সুদূর আদর্শের অস্পষ্ট আহ্বান পৌঁছিয়াছে – তাহার সকল রূপ, সকল দিক, কার্যকারণ বিচার করিবার মতো তাহাদের না আছে চিন্তার দৃঢ়তা, না আছে চিত্তের স্থিরতা,– একটা কিছু করিতে হইবে, একটা ভাবময়, গৌরবময়, আবেগময় অনুষ্ঠান, যাহাতে আত্মদানের মহিমা আছে, স্বার্থত্যাগের তীব্র মোহ আছে।''[১৬]

অমিতের মানস চিত্রপটে ভেসে ওঠে যে একদিন মণীশ ক্লান্ত দেহমন নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল সুনীলের কাছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে আদরে লালিত সুনীল সৌহার্দ্যবশত বন্ধুর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। এভাবেই সুনীল মণীশের সংস্পর্শে এসে সন্ত্রাসের এই পথে ঘর ছেড়েছিল। সেদিন মণীশের উদ্দেশ্য, কাজকর্মে, দেশোদ্ধারে সুনির্দিষ্ট কোন্ পরিকল্পনা, পথ সুনীল বোঝেনি, বোঝার অবকাশ পায়নি। সে শুধু বুঝেছিল এই খুন, খারাপি, বা প্রয়োজনে চুরি-ডাকাতি নিজের জন্য নয়। তা দেশোদ্ধারের মহৎ কাজে উৎসর্গ হবে। মণীশ সুনীলের কাছে আহ্বান করেছিল শুধু টাকা নয়, তারা চায় লক্ষ্মীছাড়া, সৃষ্টিছাড়া,

ঘরছাড়া করে সুনীলদের মতো যুবকদের। ভঙ্গুর সময়ের তীব্র দাহে তখন স্কুল, কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সে সময় সুনীলও পথে-পথে, মেসে-মেসে, মিছিলে ঘুরে একটা কিছুর পথ খুঁজেছিল। কিন্তু সেই সময়ে অনির্দিষ্ট অস্থির ভাবাবেগে উদ্বেল সুনীলের সতীর্থরা নিরুপায় হয়ে একে একে বাড়ি ফিরল। সুনীলও বাড়ি ফিরল কিন্তু তার মনের আগুন তো নেভেনি। তাই মণীশের সংস্পর্শে হাওয়া পেয়ে সুনীলের ভিতরের আগুন জ্বলে উঠল, — 'অমিত দেখিল, শীতের নিষ্প্রভ রৌদ্রে যেন একটা আগুনের তীব্র স্ফুরণ ফুটিল।' আগুনের স্ফুরণ ফুটল সুনীলের মধ্য দিয়ে ঠিক কিন্তু অমিত ব্যথিত হয় তাদের খণ্ডিত চেতনার নিরালম্ব জীবনত্যাগে। এই ত্যাগ তাদের নিজেকেই নিজের শত্রু করে তুলেছে। উদ্দেশ্য জানা নেই, পথ চেনা নেই, নেই সুনির্দিষ্ট সংগঠন শুধুই সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নিজেও হয়ে পড়েছে ত্রস্ত। ইংরেজের শক্তিকে ভাঙতে গিয়ে তারা নিজেই অকালে ভেঙে যাচ্ছিল। মণীশ সুনীলের আশ্রয়ে এসে সুনীলকে ভরসা করতে পারেনি। তাই পরে বন্ধুর সৌহার্দ্যে পরিতপ্ত হয়ে বলেছিল,—

> ''মানুষের সহজ প্রশ্নকে মনে হয় কুটিল; সোৎসুক দৃষ্টিকে মনে হয় সর্পিল।
> মাফ করিস সুনীল, অবস্থার চক্রান্তে আমার মন বেঁকে চুরে যাচ্ছে, ভেঙে
> খান খান হয়ে গেছে।''[১৭]

অমিত অনুভব করে সুনীলেরও আজ একই অবস্থা। মণীশের সংস্পর্শে সে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খ্যাতি, যশ, সম্মানের সাচ্ছন্দ সুলভ পারিবারিক গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অগ্নিযুগের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। আজ নাম, পরিচয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। অমিতের কাছে সে টাকা চায় কিন্তু টাকা কেন চায় তার উদ্দেশ্য গোপন রাখে। অমিতের উৎসুক আগ্রহী দৃষ্টিকে অবান্তর কথার আড়ালে চেপে যায়। অমিত জানে সুনীল তাকে কিছুই বলবে না — আর অমিতও তাকে শুধু সাহায্যই করতে পারবে। তার বিচ্ছিন্ন পথের নিষ্ফলতার দিক সুনীল বুঝতে চায় না। সঠিক আন্দোলনের পথের দিশা দেখানো সমস্তই ব্যর্থ হবে সুনীলের সমক্ষে। সুনীল মণীশের সংস্পর্শে, আহ্বানে ঘর ছেড়েছে এই পথে। —

> ''তখন হইতেই সুনীল ভাসিতেছে — অমিতের চোখের সম্মুখে — একটা
> আগুনের ফুলকির মতো মণীশ নিবিয়া গেল। ... বিজয় ছাইচাপা পড়িয়াছে।
> রহিয়াছে শুধু সুনীল .... ব্রাত্যান্দোলিত অগ্নিশিখার মতো লেলিহান।''[১৮]

অমিত যেন সময়েরই প্রতীকী সত্তা। তাই অস্থির সময়ের কোনো কিছুই অমিতের দৃষ্টি বা জীবনকে ছাড়িয়ে যায়নি। অমিতের মানস জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হলেও গেছে। সুনীলদের প্রয়াস জনবিচ্ছিন্ন, তারা ব্যর্থ পথের দিশারি। কারণ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও তারা ছিল নিজের পরিবার ও সমাজের কাছে ব্রাত্য। সমাজের চক্ষে ঘৃণা ও ভয়ের যুগ্ম বাহক এবং সরকারের কাছে অপরাধী। তারপরও অমিত তাদের ব্রাত্য করেনি বরং সংবেদনশীল হৃদয়ে তাদের আগলেছে সাধ্যমতো। তারা পথ চিনতে পারেনি কিন্তু যুগের চাহিদাকে মেটাতে সাড়া দিয়েছে। সুনীলের অর্থাৎ বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের বিচ্ছিন্ন পথ কোনও সুনিশ্চিত মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃত অস্ত্র হতে পারে না অমিতের বিবেচনায়। মোতাহের, দীনু এবং কমরেড দাশদের শ্রমিক আন্দোলনের পদক্ষেপে অমিত সহায়তা করে। ইস্তাহার লিখে শ্রমিকদের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য। টাকার সমস্যায় দীনু, মোতাহেররা প্রেসে ইস্তাহার ছাপাতে পারবে না। এই কথা শুনে অমিত দীনুকে টাকা জোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। কিন্তু অমিতের সূক্ষ্ম সচেতন অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এদের সীমাবদ্ধতা, মতান্ধতা ও উগ্রতা। তারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশ্বাস করে না, জাতীয়তাবাদকে সমাজতন্ত্রের শত্রু ভাবে। জাতীয় বিপ্লববাদীরা তাদের মতে বুর্জোয়া সহায়ক। তাই তারা সেখানে কুমতলব দেখতে পায়। অমিত ভাবে এবং বলে প্রথমে এই জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে জোটে শক্তি একত্রিত করে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা দরকার। কিন্তু অমিতের সূক্ষ্মতম মতামত তারা গ্রাহ্য করে না। তাদের ধারণায় কাজে সোজা-মোটা বুদ্ধিই কাজ করে। মোতাহের বলে,—

> ‘‘দরকার হলে দু-দশটা খুন করে ফেলতে হয়, ইউনিয়নকে খাড়া রাখতে হলে ওসব ভয় করলে চলবে কেন? নইলে তো ইউনিয়নই গিয়ে পড়বে ধনিকদের আওতায়, তাদের ফ্লাঙ্কিদের কর্তৃত্বে।’’[১৯]

অমিত বুঝেছে মোতাহের কাজ করে কিন্তু তার নিজস্ব নির্দিষ্ট মতামত নেই। খবরের কাগজ বিভিন্ন আলোচনায় শুনতে শুনতে সেই কথাগুলোকেই নিজের ভেবে নিয়েছে। বিপ্লবী কর্মপদ্ধতির গভীরতা, সূক্ষ্ম ভাবনা তার মধ্যে নেই। তাই সরাসরি সোজা দেশীয় ধনিকদেরই ইউনিয়নের শত্রু ভেবে নিয়েছে। প্রথমে তাদেরই প্রয়োজনে সরাতে চায়। থার্ড ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষাপ্রাপ্ত জার্মান ফেরৎ কমরেড দাশেরও একই সিদ্ধান্ত —

> ‘‘যখন দরকার দু-চারটাকে আমরা সরিয়ে পথ কেটে নেবো।’’[২০]

দীনুর মনে হতাশা, সে অমিতকে বলে কাজে তার তৃপ্তি নেই। মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রেললাইনে মাথাটা শুইয়ে দিয়ে সব চুকিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় তার। অমিত দেখেছে তাদের একটা লক্ষ্য ও পদ্ধতি আছে। কিন্তু পথ ও পাথেয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঠিকমতো রাখতে পারছে না বলেই এই হতাশা। অমিত তাদের বোঝাতে পারে না। তাই তার অভিজ্ঞ সূক্ষ্ম চিন্তার-বিবেচনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ইস্তাহারের লেখায়। ধনিক ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে। সে নিজের অভীপ্সিত আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহবর্ধক আশীর্বাদবাণী জোড় কলমে লিখে,— 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।' অমিতের আশঙ্কা হয় বিচ্ছিন্ন মতান্ধতায় এই খণ্ডিত বিপ্লবী চেতনার আয়ু যেন ক্ষীণ না হয়ে পড়ে হতাশার গর্ভে। অমিত তাই ভাবে যেভাবে হউক—

> ''মোতাহেরকে শুধু বোঝানো দরকার যে একক বা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে শক্তি নষ্ট হয়; সকলকার একত্রিত, স্বনিয়ন্ত্রিত প্রয়াসেই কাজ সম্ভব।''[২১]

অমিত যুগের দাবিকে সাড়া দিয়ে কম-বেশি যারা কর্মে জড়িয়ে পড়েছে তাদের উৎসাহ দেয় এবং সাহায্য করে। যদিও সে এখানে কর্মবীর নয় তার ভূমিকা চিন্তাবীরের। অমিত সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে এখনও যুক্ত নয়। সে সবার কাছে যায়, সবাই তাকে চায়। কিন্তু অমিত কী চায় সে নিজেই এখনও খুঁজে পায়নি।

> ''জনগণের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এসব প্রয়াসে অমিত বিশ্বাস হারাইয়াছে অনেকদিন — অথচ সে জানে, ইহার রোমান্টিক আপীল মধ্যবিত্তদের পাইয়া বসিয়াছে। প্রকাণ্ড পৃথিবীর ভিত্তি তাহাতে বিন্দুমাত্র নড়িবে না।''[২২]

অমিতের মধ্যে চলছে সবসময় একটা টানাপোড়েন। সে বারবার আওড়ায়, Time is out of joint, Time is out of joint, সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। তাই বোধহয় অমিত সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুনীলের জন্য, মোতাহেরদের অর্থ সাহায্যের জন্য। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। বাসের মধ্যে বসে অমিত স্মৃতির অতলান্তে ডুবে যায়। সে ভাবে তার সহপাঠীদের কথা। শৈলেনকে বাসে পেয়ে যায়। শৈলেন অমিতের এম.এ ক্লাসের বন্ধু, আজ বিষয়ী ভাবনায় লিপ্ত কিন্তু আগে সে এমন ছিল না। সুহৃদ ও সাতকড়িদের ফাঁকা ইনটেলেকচুয়ালিজম তাকে ব্যথিত করে। আজ তারা শুধু বুঝে সচ্ছল জীবন, টাকা, বিষয় এবং শৌখিনতার তাড়নায় ভাল বাঁধায়ের বই কিনে আলমারি সাজানো। ছাত্রজীবনে শৈলেনের

চিন্তায়, গভীর আন্তরিকতায় অমিত অনুভব করত তার সৃষ্টিশীল, রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে। কিন্তু আজ সে খুব হতাশা বোধ করে (bore)। শ্বশুর হাইকোর্টের উকিল, পসার ভাল। তার মুখে জাস্টিস দে, স্পেশাল পাওয়ার ছাড়া কথাই নেই আজ। সুহৃদের লঘু চিত্ত, অগভীর আত্মার অসাড় ইনটেলেকচুয়ালিজম আর সাতকড়ির সেক্স সাইকোলজির স্পৃহা তাকে পীড়া দেয়। একদিন অমিতকে ঘিরেই ছিল সবার আগ্রহ। কিন্তু আজ অমিত তাদের ধারে কাছেরও নয়। কারণ অমিত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অমিতের প্রতি তাদের কোন ইন্টারেস্ট নেই। অমিতের মনে হয়, 'এমনই জীবন। শুধুই ছাড়াইয়া যাওয়া।' কিন্তু অমিত তো সময়ের আহ্বানকে ছাড়াইয়া যেতে পারে না। সে ইতিহাসের ছাত্র; মানবসভ্যতার গবেষক ও দ্রষ্টা। সে সময়ের দাবিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। সে খুঁজে 'চিন্তার মুক্তি, চেতনার আত্মপরিচয়।' এই মুক্তি এবং পরিচয় এখনও অমিত আবিষ্কার করতে পারেনি বলেই সংশয় আন্দোলিত অমিত সবাইকে স্পর্শ করে। তার মন বলতে থাকে 'Time is out of joint' — এই বোধই তাকে সময়ের প্রতীকী সত্তায় পরিণত করে। অমিতের টানাপোড়েন, দ্বিধা তার অস্তিত্বের প্রতিরূপ। সে চিন্তায়, কর্মে লড়াই করে বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে। অমিত চায় সমগ্রকে সমবেত করে প্রকৃত মুক্তির অভিযাত্রা। অমিতকে নিয়ে নিজের মত করে সবার প্রত্যাশা। বাবার বন্ধু ব্রজেন্দ্র রায় বলেন কিছু চিহ্ন রেখে যেতে সৃষ্টির মাধ্যমে। সুরো অভিযোগ করে অমিত কেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। ব্রজেনবাবুর বন্ধুরা অনুকূলবাবু ও বঙ্কিমবাবু অমিতকে টেকস্‌ট, নোটস লিখতে বলে, বিষয়ী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। ইন্দ্রানী তাকে স্ট্যালিনের দাস বলে। মোতাহের, কমরেড দাশ তাকে ভাবে 'নারড়িক' বা 'সোস্যাল রিভল্যুশনারী'। বাবা, মায়ের নির্বাক অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে ভয় হয় অমিতের। সবার অভিযোগ অনুযোগ অমিতের প্রতি কিন্তু অমিতের অন্তরাত্মা নির্বিকার, নিবিষ্ট মনে করে চলেছে মহত্ত্বের সন্ধান। দীনু পথ খুঁজে পাচ্ছে না, সুনীল অলক্ষ্য পথে ঘুরছে। কে কাকে পথ দেখাবে তা নিজে ছাড়া কে বলতে পারে। অমিত নিজেকেই প্রশ্ন করে,—

> "তোমার পথই কি তুমি চিনিয়াছ, খুঁজিয়া পাইয়াছ অমিত।"[২৩]

অমিত সর্বত্র বিচরণ করে পথ সন্ধানের জন্য। কারণ, সে এই কর্মের যুগে সঠিক কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে চায়। সঠিক কর্মক্ষেত্র খুঁজে পায় না বলেই সংশয়ের দোলা লাগে। তার মন তাকে অস্থির করে তোলে 'Time is out of joint'। অমিত মহামানবের সম্মিলিত পথের পদাতিক হতে চায় কিন্তু কোন পথে সে কর্মের যাত্রারম্ভ করবে। চিন্তার মুক্তি এখন সে চায়। চায় বলেই সে সর্বত্র সবার মধ্যে নিজের সত্তার

মুখোমুখি হতে চায়। মজুর, আর মেয়ে, স্বদেশি ও বিপ্লবী সবাইকে কাছে টেনে নিয়ে সম্মিলিত প্রয়াসে ধাবিত হতে চায়। অপূর্ব অমিতের সূক্ষ্ম এই অনুভূতির জায়গা ধরতে পারে না। সে সুহৃদের কাছে অমিতের আচরণ, চাল-চলনের সমালোচনা শুনে বিব্রত হয়। ফলেই অমিতের কাছে অভিযোগের সুরে বলে, অমিত ঐতিহাসিক কালচার্ড, অমিতের ধ্যান-ধারণা স্বচ্ছ। অমিত যুগ যুগান্তরের কথা, মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ধ্যান করে দৃষ্টিগোচর করাবে সবাইকে। কিন্তু অমিতের চলাফেরা কেন শুধু ওদের নিয়ে,—

> ''তুমি এসব ছাড়বে কি না? কোন সব? .... মজুর আর মেয়ে সমাজ —
> তোমার স্বদেশী আর সর্বনাশীদের।''[২৪]

সত্যিই তো অমিত ঐতিহাসিক। তাই সে মানবের সভ্যতার সংকটকালে ধ্যান, জ্ঞান নিয়ে থাকতে পারে না। যুগের দৃষ্টিই যে এই যুগের সৃষ্টি। যুগের ঘূর্ণিকালে তার দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত হয় এটা কর্মের যুগ 'This is the age of Action'। অমিতের অন্তর্দৃষ্টিতে যে গভীর বাস্তব বিধৃত তা হল কাজের ডাক। দেশমাতৃকার উদ্ধারে আত্মোৎসর্গের উৎসাহ দেওয়া। সঠিক পথ সন্ধান করা। তাই সে জানায় ব্রজেনবাবু, বঙ্কিমবাবু ও অনুকূলবাবুদের প্রত্যাশা পূরণে আপাতত সে ব্যর্থ। কারণ অমিতের আত্মা মহামানবের মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়ার আহ্বান শুনেছে। অমিত অনুভব করেছে এ যুগের দৃষ্টি এ যুগের সৃষ্টি। এ যুগ লেখাপড়ার নয়, কাজের যুগ। বঙ্কিমবাবু বিস্ময়ে জানতে চান কাজের যুগের মানে কী। ব্রজেন্দ্রবাবু ব্যাখ্যা করেন অমিতের উপলব্ধ দর্শন,—

> ''যে কাজের ডাক মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নাড়া দেয়, সেই কাজ অনেকাংশে
> সেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় রূপ নিয়েছে।''[২৫]

লেখক গোপাল হালদার অমিতের ধ্যানে-জ্ঞানে পরিস্ফুট করে তুলেছেন যুগের দাবিকে। যৌবনের কাছে তার প্রত্যাশা অনেক বেশি। কর্মক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব রক্ষায়, জাতির জীবনের রক্ষায় বলি দিতে হবে নিজেদের। না হলে উপায় নেই অস্তিত্ব রক্ষার। অমিত ব্রজেন্দ্র, বঙ্কিম ও অনুকূলবাবুদের মাধ্যমে যেন ঐতিহ্য ও প্রাচীনের বাহকদের কাছে অনুরোধ ও আহ্বান জানাল। যুবা শক্তিতে দেশের কাজে নিয়োজিত করতে। গোপাল হালদার সময়ের দাবদাহের মুহূর্তে যেন ইঙ্গিতে, ইশারায় প্রতিবেদনে বুড়োদের কাছে আবেদন জানালেন। সব বাঁধন ভেঙে যুবাশক্তির সংগঠনে একটা জেনারেশনকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়ারই আহ্বান জানালেন, কারণ সময় বয়ে যাচ্ছে, 'out of time, out of time'। দীপুকেও অমিত বলেছিল প্রেরণা

জুগিয়েছিল, কাজ বেশি সে তুলনায় লোক কম। তাই সে যেন আত্মহত্যার কথা না ভাবে। অমিতের আহ্বান—

> ‘‘একটা জেনারেশনকে আপনাদের বলি দিতেই হবে। ... কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের জেনারেশন যদি তার মনুষ্যত্বের প্রমাণ দিতে পারে তা হলে এসব বিক্ষোভ কেটে যাবে, দেশের আকাশ মেঘমুক্ত হবে, পৃথিবীতে নূতন সূর্যোদয় সম্ভব হবে। তা হইলেই এর পরের জেনারেশন আবার চিন্তায় ও সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।’’[২৬]

ত্রিদিবার তিনটি খণ্ডের ‘একদা’ এর মধ্যে গোপাল হালদার নায়কের একটি দিনের পরিক্রমাকে দেখিয়েছেন। স্মৃতি রোমন্থনে একটি দিনে নিয়ে এসেছেন অজস্র দিনের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার বাস্তব। এই বাস্তবের প্রতিরূপের অন্তরালে মানসচরিত্র অমিত মানসপটে বিশ্লেষণ করে চলেছে সময়ের তাগিদ। যুগের আহ্বান এবং নরনারীর সামাজিক দায়িত্বের রূপরেখা। তাই সময়ের অস্থির দোলাচল অমিতকে এমনই একজন পরিব্রাজকের ভূমিকায় উপস্থাপন করেছে যা জরুরি ছিল। কারণ অমিত যদি প্রথমেই রাজনৈতিক সক্রিয় কর্মীরূপে প্রতিস্থাপিত হত; তাহলে আমাদের কাছে বিভিন্ন দলীয় সংগঠনের ফাঁকা, সীমাবদ্ধতা, মতান্ধতার ছবি স্পষ্ট হত না। এবং সেই সময়ের (ত্রিশের দশকের) সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া লেখকের পক্ষে সম্ভব হত না। বিচক্ষণ লেখকের উদ্দেশ্যনিহিত বক্তব্যের মূলে ছিল রাজনৈতিক কিছু মতান্ধতা ও সীমাবদ্ধতার কথা এবং দলানুবর্তিতার ফলে বিচ্ছিন্নতার রূপ স্পষ্ট করা। যে-কারণগুলোর জন্য সংগ্রামী শক্তির ভিত দুর্বল হয়েছিল তারই স্বরূপ উদ্ঘাটন। প্রকৃত স্বাধীনতার পথে যে মতবিরোধগুলো অন্তরায় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছিল তার কথা। একদা-য় সময় অমিতকে কীভাবে ভাবাল, দোলাল, পাল্টাল তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। এবং সে সমস্ত যাচাই করে একটি সঠিক পথের দিশা পেল যেখানে সে কর্মবীর। যেখানে সে হ্যামলেটের সংশয় বিদীর্ণ করে পৌঁছে গেছে সিদ্ধান্তে। সে বুঝতে পারে হ্যামলেট আসলে চিন্তাবীর বলেই কর্মবীর। সচেতন চিন্তার মধ্য দিয়েই পরীক্ষিত হয়ে যায় সঠিক কর্মপথ। তাই অমিতের সমস্ত তুচ্ছতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দ্বিধা সংশয় কেটে অমিত সংগ্রামের পৃথিবীর নতুন দিশা খুঁজে পায়। সময় চলমান অমিতও চলমান, কারও শেষ নেই,—

> ‘‘*For you, you too, to battle go,*

not with marching drums and cheers..

But in the watch of solitude.

And through boundless night of fears,

your infinite passion is outpoured."[২৭]

এসব চিন্তার মধ্যে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ অমিতের কানে বুটের পদশব্দ সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছল। অমিত গ্রেপ্তার হল। গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়েই অমিত পৌঁছে গেল তার লক্ষ্যে, কর্মক্ষেত্রের আঙিনায়, জীবনের মহাপাঠশালায় 'অন্যদিন'-এ বিপ্লবী সহযাত্রীদের কাছে। একদা ছিল অমিতের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, চিন্তা চেতনার সংশ্লেষণমূলক পাঠ। আর অন্যদিনে অমিত পেয়ে যায় দ্রষ্টাচক্ষু দিয়ে আহৃত অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধকে। বন্দীজীবনের অবকাশে যাচাই করে সঠিক কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের পথ।

অন্যদিনে অমিত জেলে রাজবন্দীরূপে আবদ্ধ। এখানে শুরু হয়েছে জীবনের মহাপাঠশালায় নিজের অভিজ্ঞতাগুলোকে যাচাই করে নেওয়ার পালা। জেল-জীবনে অমিত সম্মিলিত হয়েছে আরো অনেক রাজবন্দীদের সঙ্গে। ১৯৩৭-৩৮ সালের বিশেষ একটি দিন 'অন্যদিন'। সেদিন অমিত জেলজীবন থেকে মুক্তি পাচ্ছে। অন্যদিনে প্রকাশ পেয়েছে ৩০-এর দশকের মুক্তিপথযাত্রী অসংখ্য তরুণ, কৈশোর ও প্রৌঢ় রাজবন্দীদের বহুকৌণিক মতাদর্শ, ভাবনা ও ব্যক্তিগত জীবনের চলচ্ছবি। 'অন্যদিন' অমিতের বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার, নানা চরিত্র-চিত্রশালা সন্নিবেশের স্মৃতিঘর। জেলজীবনে অমিতের ছোট বড় অনেক রাজবন্দীদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হত। অমিত এখানে পেয়েছে রঘু চোরকে। যে সবসময় অমিতের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। অমিত এই ছোট অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও দেখেছে মানুষের আন্তরিক সত্যকে। জেলখানার ভেতর বসত পড়াশোনা ও আলোচনার আসর।

শেখর, সুনীল, জ্যোতির্ময়, বিভূতিরা পেরেড করে, ব্যায়াম করে, খেলা করে। সৈনিকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু অমিত যখন বলে, প্যারেড ও জঙ্গিপনার স্বরূপ কি বুঝে তারা? তখন তাদের মনেও সংশয় জাগে। শেখর, সুনীল বলেছে তারা স্বাধীনতার দ্বিধাহীন, দ্বন্দ্বহীন অস্ত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু বুঝতে চায় না। তারা অমিতের কাছে স্বাধীনতা অর্জনে যুদ্ধের মূল স্বরূপের উত্তর চায়। অমিত যে মনে প্রাণে মানুষের ও মানবতার পথিক ও পথপ্রদর্শক। তার তীর্থই হল মানব। আর হল মানুষের কল্যাণ। সে মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখতে পারে না। তাই শেখর, সুনীল, জ্যোতির্ময় ও বিভূতিরা যে সন্ত্রাসবাদের যন্ত্ররূপে

পরিণত হয়েছে। এই কথাটা বোঝায় পরিহাসছলে,—

> ''মানুষকে অস্ত্রে পরিণত করিলে কি যুদ্ধ জয় করা যায়? না, মানুষ তাতে সার্থক হয়? মানুষ তো যন্ত্র নয়, সে যন্ত্ররাজ; তাই সে জয়ী।
>
> ... যদিও আমি জানি এই শক্তিচয়ের ডায়ালিকটিক্যাল দ্বন্দ্ব সমন্বয়েই জয়, তবু জানি মানুষকে যুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত করে যুদ্ধ জয় হয় না, মানুষকে যন্ত্ররাজ করেই যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়। আর তাই সর্বকালের স্ফিঙ্কসেরই প্রশ্নের উত্তর এক;— 'মানুষ'।''[২৮]

জ্যোতির্ময়, শেখর ও বিভূতি রায়দের মতো অনেক দামাল ছেলেরাও সেদিন মার্ক্সবাদের দীক্ষা নিয়েছে। এরা আগে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পরিবার, ভয়, মৃত্যু সমস্তকে উপেক্ষা করে সন্ত্রাসবাদের পথে দীক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু আজ বন্দীশিবিরে আলাপ আলোচনায়, অধ্যয়নে বুঝেছে মার্ক্সবাদকে। তারা মার্ক্স লেনিনের বই পড়ে। অমিত ও আরও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে এই দামাল তরুণদের মধ্যেও জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে। তারা বুঝেছে —

> ''বস্তু ছাড়া বস্তু নাই, আর মার্কস সেই বস্তু ব্রহ্মের প্রবক্তা, কমিউনিজ্‌মই পথ আর কোমিন্টানই গতি।''[২৯]

শেখর আলোচনায় বিচার-বিশ্লেষণে কমিউনিজমের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। সুনীল সে-পথে আসেনি। সে 'লাল কেতাব' ছুবে না।

শেখররা ধীর, স্থির, প্রাজ্ঞ তাই তারা বুঝেছে অমিতের ব্যাখ্যা এবং তারা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ প্রস্তুত করতে প্রচেষ্ট। কিন্তু সুনীল অধীর, অস্থির সে এই পথ মানবে না। ফলে বন্ধু শেখরের সঙ্গেও কথা বন্ধ করে দেয়। জেলে আরোও তর্ক-বিতর্ক হত শশাঙ্কনাথ, নিরঞ্জনদের সঙ্গে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় বিতর্কে জেল বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। 'চার অধ্যায়' নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অমিতের মতো আরও হাজার সংগ্রামীদের রক্তঝরা ইতিহাস অভিজাত বর্গের কীর্তি-কাহিনিতে স্থান পাবে না। তাই তাদের আশা তাদের বলিদানের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস কবির রচনায় বন্দিত হবে। কিন্তু 'চার অধ্যায়'-এ বিপ্লবী দুরন্ত সন্তানদের পরিচয় ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে তারা অপমান বোধ করে, মনে পীড়া পেয়েছে। অমিত অনুভব করেছে মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বাধীন

স্বদেশিদের কাছে তারা অবজ্ঞার পাত্র। জওহরলাল বা রাজেন্দ্রপ্রসাদও তাদের কখনও জনসম্মুখে অভিনন্দন জানাবে না। কিন্তু মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের হাতেও কি বিকৃত পরিচয় লাভ করবে। অমিত ভাবে এই কবিই তো বেদনাবিহ্বল হয়ে মনুমেন্টের নীচে বিধাতার প্রতি আত্মজিজ্ঞাসা করেছিলেন — 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?' কিন্তু এই কবিই 'চার অধ্যায়' যেভাবে প্রস্তুত করেছেন তাতে বিপ্লবীরা মর্মাহত। অমিত লক্ষ করেছে তাদের ক্ষোভকে—

> ''বিক্ষোভে ও অপমানে কাব্যের সত্যকে অস্বীকার করিবার জন্য অধীর প্রায় সকলে। এ কি লাঞ্ছনা কবির হাতে তাঁহার জাতির যৌবনের। এক খণ্ড 'চার অধ্যায়' পোড়াইয়া ফেলিলেও সুধীনের মনের ক্ষোভ মিটিবে না।''[৩০]

গোপাল হালদার ত্রিদিবার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়েছেন বিশেষ কারণে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার সাধনার ব্রত তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথকে গোপাল হালদার স্বীকার করে নিতে পারেননি। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ পথে নেমে বঙ্গভঙ্গের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সে-আন্দোলন বয়কটের রূপ নিলে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন। কারণ তাঁর কাছে এটা ছিল নেতিবাচক আন্দোলন যাকে তিনি সমর্থন করেননি। তাঁর উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশও বয়কট আন্দোলনে যোগ দেয়নি। নিখিলেশের মধ্যে লেখকের নিজস্ব জীবনের ছাপ পড়েছে মনে হয়। অন্যদিকে নেতিবাচক দিকটি স্পষ্ট করতে সন্দীপের মতো রাজনৈতিক চরিত্রের কদর্যতায় ভরা রূপচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তিনি নিখিলেশের মতো জমিদার, ইংরেজি শিক্ষিত মহৎ চরিত্রের উপরই আস্থা স্থাপন করেছিলেন। সেখান থেকে বোঝা যায় তিনি সামন্ততন্ত্রকেই বেশি সমর্থন করতেন। তিনি জমিদারি প্রথার বিরোধিতা করেননি। 'চার অধ্যায়'-এর মতো উপন্যাসে দুরন্ত বিপ্লবীদের বিকৃত পরিচয়ে 'ত্রিদিবা'র সুধীনদের মতো তরুণরা মর্মাহত হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির উপন্যাস লিখলেও সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের সঙ্গে বাস্তবে সরাসরি যোগ ছিল না। যা দেখেছেন, বুঝেছেন দূর থেকে। তাই মনে হয় গোপাল হালদারের মতো সচেতন বিপ্লবী-কর্মী দুরন্ত বিপ্লবীদের আসল স্বরূপটি উদ্ঘাটন করতেই 'চার অধ্যায়'-এর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। কারণ তাঁর প্রতিসত্তা অমিত যেভাবে সুনীল, মণীশ, শেখর, জ্যোতির্ময় ও বিভূতিদের সঙ্গে মিশেছে। অন্তর থেকে তাদের অন্তর্দাহকে অনুভব করেছে। সঠিক পথ দর্শানোর চেষ্টা করেছে। তাদের নেতিবাচক প্রয়াস যদিও সমর্থন করতে পারেনি। কিন্তু তাদের

আত্মত্যাগকে প্রণাম করেছে। রাজনীতি সচেতন রাজনৈতিক বিপ্লবী কর্মী গোপাল হালদার তাদের কাছ থেকে দেখেছিলেন, অনুভব করেছিলেন। এই দিকটি স্পষ্ট করতেই গোপাল হালদার রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর মধ্যের বিকৃত ভাবকে সমালোচনা করেছেন। এখানে গোপাল হালদার নেতিবাচক, ইতিবাচক, পথের বিপ্লবী ও সংগ্রামী, শ্রমিক ও মজুরদের প্রকৃত রূপকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। কারণ সর্বক্ষেত্রে নির্বাধ বিচরণের মাধ্যমে রক্তঝরা অস্থির সময়ের মানুষের সত্য স্বরূপটি উদ্ঘাটন করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী হয়েও সর্বসম্মিলিত স্বাধীনতার পথে শ্রমিক, কৃষক আন্দোলনের গণপথে এসে দাঁড়াতে পারেননি। আর সাম্যবাদী অগ্রদূত গোপাল হালদার রবীন্দ্রনাথ থেকে এখানেই স্বতন্ত্র এবং কর্মে, ধর্মে ও সাহিত্য সাধনায় অন্যপথে যাত্রা করেছিলেন। তাঁর যাত্রা মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে শ্রমিক, মজুর সবার সম্মিলিত আন্দোলনে মানুষের মুক্তির পথে। তাই গোপাল হালদার 'ত্রিদিবা'-র প্রথম খণ্ড 'একদা' উৎসর্গ করেছিলেন সেইসব দুরন্ত দামাল ছেলেদের।

অমিত জেলে আরও পেয়েছে সুশীলদা ও নিরঞ্জনের মতো গুণী শ্রদ্ধাবানদের। সুশীলদা গম্ভীর প্রকৃতির লোক স্বল্পভাষী, মজলিসে সবার সম্মুখে কথা বলতে তার দ্বিধা হয়। সুশীলের গম্ভীর ভাবমূর্তির জন্য সবাই তাকে সমীহ করে চলে। কিন্তু অমিতের সঙ্গে চলে তার আলাপ-আলোচনা, অধ্যয়ন। বাকি রাজবন্দীরা বুঝে পায় না এমন লোকের সঙ্গে অমিতের হৃদ্যতা কী করে হয়। অমিতের সঙ্গে সুশীলদা কখনও ফ্রেজারের 'গোল্‌ডেন বার্ড' আবার কখনও এঙ্গেল্‌সের 'পরিবার গোষ্ঠী রাষ্ট্র' বা 'সমাজবাদী চিন্তার ইতিহাস' ও মার্কসের 'ক্যাপিটেল' নিয়ে বসেন। অন্যরা ভাবে এই প্রকাণ্ড বইগুলো পড়ার জন্যই এই বন্ধুত্ব। কিন্তু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের মুক্তির পথে যে-অমিত চলতে চায় সে-ই বুঝতে পারে সুশীলদার গম্ভীর প্রকৃতির অন্তরালের বয়সের ভারে ন্যুব্জ মানুষটিকে। ১৯০৫ থেকে স্বাধীনতার মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার এ পথে নেমে অনেক ঝটিকা, পীড়নের উত্তাপ বয়ে গেছে তার জীবনে। প্রথম মহাযুদ্ধের দাবদাহে, রায়মঙ্গলের মোহানায়, বনে জঙ্গলে কেটেছে। স্বাধীনতার প্রতীক্ষায় সমরাস্ত্রের অপেক্ষায়, ডুলাঙ্গা হাউসে পুলিশের নির্যাতন, হাজারিবাগ জেলে সত্তর দিনের অনশনও করেছিলেন। তারপরও ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু সাধনার ফল তিনি এখনও দেখতে পাননি। সংগ্রামের পথে সময়ের ঘাতে-প্রতিঘাতে বয়সের ভারে তার শরীর ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনি অধ্যয়নের মাধ্যমে সময়ের দাবিকে মেটাতে চান। আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বেল হয়ে জানতে চান আজকের আন্দোলনের সঠিক পথ কোনটি। না জেনে তিনি কিছু

গ্রহণ বা বর্জন করবেন না। তাই অমিতের সঙ্গেই চলে তাঁর সঠিক পথ সন্ধানের অধ্যয়নপর্ব। 'চার অধ্যায়' সুশীলদাকেও বেদনাহত করেছে। অমিতের 'চার অধ্যায়' ভাল লেগেছে। কারণ সাহিত্য বাইরের নয় ভিতরের সত্যের কারবারি। সাহিত্য বিভিন্ন ঘটনা চিন্তা ও প্রয়াসের স্থূল রূপ থেকেই ছেঁকে তুলে নেয় মূল সত্যটুকু। যেখানে মানুষ মানুষরূপেই ধরা দেয় দেবতা নয়, বা জীবনের আসল রূপটিই প্রকাশ পায়। কারণ সে-সময় বিপ্লবীদের মধ্যে নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু যে রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ, যে পৃথিবীকে ভালবাসে তার মধ্যে প্রিয়জনের প্রতি, সন্তান-সন্ততির প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকবেই। যা প্রকৃত সত্য, চিরসত্য। অমিত নিজের অন্তরেই অনুভব করে এই গভীর সত্যটি। অমিতের অবদমিত মনে ভেসে ওঠে কারও কারও ছবি। কিন্তু কেউ স্পষ্ট নয়। অমিত নিজেকেই প্রশ্ন করে, কার কথা সে ভাবছে – মা, না শুধু মা নয়। আরও কেউ, কে – ইন্দ্রানী - সবিতা – কাকে ভাবছে সে। কিন্তু সে জানে কাউকেই সে পাবে না। সচেতনভাবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও সে রাখে না। কিন্তু মনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকারও তো করা যায় না। এটাই চরম সত্য। যুক্তি-বুদ্ধির জালে কেউ সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। অমিত সুশীলদাকে বোঝাতে চায়। সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে বিপ্লবী প্রয়াসে যে পরিপ্রেক্ষিত দরকার কবি সেটুকুই গ্রহণ করেছেন। আর পরিপ্রেক্ষিতের বিবেচনা করা এক্ষেত্রে অযথার্থ। সুশীলদা যিনি জীবনের ত্রিশটি বৎসর দেশের খাতিরে নিঃস্বার্থভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। তিনি কবির হাতে এই তিরস্কার মেনে নিতে পারেননি।

> ''ত্রিশ বৎসরের বাক্যহারা ইতিহাসের উপর এই রইল কি তবে একালের মহাকবির তিরস্কার — বিপ্লবের সাধনা শুধু আত্মার আত্মবিনাশ? শুধু নিজেকে, সংসারকে ফাঁকি দিয়াছি — দেশকেও পাই নাই? - - -''[৩১]

'ত্রিদিবা'-র স্বরূপ তো আসলে সাধারণে-অসাধারণের পথের সংগ্রামের বিবৃতি। অমিতের মানসদৃষ্টিতে যাদের পেয়েছি তারা সবাই নিতান্ত দারিদ্রে, অর্ধাহারে, অনাহারে বেঁচে থাকা শ্রমিক-মজুর প্রভৃতিরা। বা মধ্যবিত্ত থেকে আগত শিক্ষিত তরুণরা। যারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, ঘটনার আবর্তে, দেশরক্ষার আহ্বানে মুক্তিকাঙ্ক্ষায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। নিজেদের সঁপে দিয়েছে সংগ্রামের পথে। কারো পথ ছিল নেতিবাচক, কারো ইতিবাচক, কিন্তু সবাই তো ছিল একই মহা যাত্রাপথের পদাতিক। যাদের নাম হয়তো আজ কেউ জানে না। ইতিহাসে তাদের উল্লেখ নেই। সেই সাধারণের সংগ্রামের, জীবনোৎসর্গের বিবৃতি দিতেই তো গোপাল হালদার অভিজ্ঞতার কয়েকটি দিনের কথা তুলে ধরেছিলেন। সুশীলদা দুঃখিতভাবেই

অমিতকে বলেছিলেন ইতিহাসও তাদের অর্থাৎ বিপ্লববাদীদের বিকৃত সাক্ষ্যই দেবে। যেভাবে 'চার অধ্যায়'-এ রয়েছে। ইতিহাসে থাকবে বড় নেতা, বড় মনস্বীদের, কবিদের কথা। আর বিপ্লবীরা ভ্রান্ত ও বিপথগামী এই সাক্ষ্যই ইতিহাস বহন করবে। সেখানে থাকবে ভাগ্যবান বড় নেতৃত্বের সালংকারমণ্ডিত স্তুতিবন্দনা। কিন্তু কেউ কি জানাবে অস্থির সময়ের সাধারণের বলিদানের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনের মানুষের কথা। যে-মানুষরা রক্তাক্ত পায়ে পথান্বেষণ করেছে। রক্ত ঝরিয়ে স্বাধীনতার জয়গান করেছে। তিনি অমিতের কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন বা এটা অমিতের বাচনে লেখক গোপাল হালদারেরও আত্মজিজ্ঞাসা,—

> ''এ সব তবে বলবে কে, অমিত? যে কবি জ্বলেনি এমন করে, যে ঔপন্যাসিক
> ভালোবাসে নি এমনি ভাবে, যে দার্শনিক কোনোদিন করল না পথে পদার্পণ,
> যে ঐতিহাসিক কোনোদিন জানল না পথের মানুষকে — তারা?''[৩২]

নিরঞ্জন চেতনা দিয়ে ভালবাসে বাঙালি জাতিকে ও বাংলার সংস্কৃতিকে। আর ইংরেজ জাতিকে ঘৃণা করে। অন্য জাতিকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখে। তার বিশ্বাস সাহিত্য, শিল্পকলা ও রক্ত দিয়ে বাঙালি বিশ্বজয় করতে পারবে। সে বাঙালি 'স্টম ট্রপারস' গড়তে চায়, অমিত অনুভব করে এটা দুরাশার, পরিহাসের নামান্তর। কিন্তু অমিতের মতো সে শেক্সপীয়রের সাহিত্যের চরিত্রগুলোতে জীবনের রস খুঁজে পায়। এবং তার রয়েছে মানুষের প্রতি তীব্র জিজ্ঞাসা। মানুষের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা। সর্বত্র মানুষের যোগাযোগ চায় তার গভীর মন। এখানেই অমিতের চেতনার সঙ্গে সে অভিন্ন রূপে ধরা দেয়। অমিত চায় তাকে সহযোদ্ধা, সহযাত্রীরূপে।

অমিত আরও পেয়েছে শশাঙ্কনাথ, ভূজঙ্গ সেনদের। তাদের সঙ্গেও অমিত মত-বিনিময় করেছে। তারা পার্টি গড়তে অমিতকে চায়। কিন্তু অমিত পার্টিতে নয়, কর্মে বিশ্বাসী। সে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে যাচাই করেই কোনও সিদ্ধান্ত নেবে। তাই তাদের সম্মতি দিতে পারে না। জেল থেকে বেরোনোর সময় বেত্রাঘাত করার স্থান (টিকটিকি) দেখতেই কিশোর বারীন নন্দীর উপর নির্মম বেত্রাঘাতের দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। বারীন নন্দী এই বয়সেই যে ব্রিটিশ শাসনকে ঘৃণায়, ক্রোধে নস্যাৎ করে দিতে চায়। বার বার অমিতের অন্তশ্চেতনায় বাজতে থাকে বারীনের ইংরেজের প্রতি ছুঁড়ে ফেলা বাক্যবাণ। সে chalange (প্রত্যাহ্বান) জানায় ব্রিটিশকে। অদম্য সাহসী ছেলেটিকে অমিত দেখেছিল বারবার বেত্রাঘাতের পরও মুমূর্ষু অবস্থাতেও সে বলে,— 'চ্যালেঞ্জ ইউ? আই চ্যালেঞ্জ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার। আই চ্যালেঞ্জ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার।'

বারীন নন্দী জেলে অমিতের কাছে আসত লজিক পড়তে। অমিত সবসময় মানুষের হৃদয়ের সহজ কথাকেই স্বীকার করতে আগ্রহী। সে বুঝে পায় না গতানুগতিক নিয়মে বাঁধা লজিকের কেতাবি ভাষা কেন পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়। অমিত বাস্তব সহজ-সরল দৃষ্টান্তে জীবনের সময়োচিত লজিককেই জীবন্ত করে তুলত। অমিতের সহজ-সরল জীবন অভিজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টান্ত, যুক্তি-প্রয়োগ শুনে বারীনও অভিভূত হয়। অমিতের অন্তর বারীনের সম্পর্কে গর্বে মহিমান্বিত হয়ে বলে ওঠে —

> ''জীবনের লজিক হার মানে নাই এম্পায়ারের বেতের কাছে। - - আন্দামানে অনশনরত যে 'স্বদেশীরা' মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে বারীনের নাম অমিত দেখে নাই। ... বারীন হয়তো ফিরিবে ... তবু জীবনে একবারের মতো সেই রক্তসিক্ত বালক আপনার অন্তরাত্মার মহিমায় ইতিহাসের এই বিরাট চ্যালেঞ্জকে রূপদান করিয়াছে *and touched immortality. Only in intense living do we touch infinity.*"[৩৩]

অমিত জেল-জীবনে বিভিন্ন রাজবন্দীদের সংস্পর্শে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আলাপ-আলোচনায়, তর্কে-বিতর্কে তার মধ্যে রাজনৈতিক দর্শন স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। সে মার্কসবাদের মধ্যেই মানুষের ক্রমমুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। শশাঙ্কনাথ, নিরঞ্জন, শেখর ও জ্যোতির্ময়রাও এই পথে চলেছে। শশাঙ্কনাথ, নিরঞ্জন অমিতকে চায়। কিন্তু অমিত মতাদর্শকে গ্রহণ করেও তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। কারণ সচেতন শিল্পীর, বিপ্লবীর প্রতিসত্তা অমিত চায় মতাদর্শ ও কর্মের ভারসাম্য, ঐক্য। কারণ কর্মের মধ্য দিয়েই মতাদর্শ প্রস্ফুটিত হয়। মার্কসীয় ভাবাদর্শে সে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তা কতটুকু গ্রহণীয়, সত্যের মুখোমুখি হয়ে তা প্রয়োগের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে চায়। অমিত কোন 'ডগমা'-য় বিশ্বাস করে না। কমিউনিজমকে ভারতীয়দের চিন্তা-চেতনার উপযোগী করে প্রয়োগে সে বিশ্বাসী। তত্ত্বের সত্যে সে উপনীত হয়েছে। তত্ত্বকে ব্যবহারিক জীবনসত্যের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেই অমিত এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অমিতের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বিভিন্ন মতাদর্শের সংগ্রামীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। কারণ জাতীয়তাবাদী, স্বদেশি এবং সন্ত্রাসবাদীরা একে অপরের মত ও পথের সমালোচনা ও আক্রমণ করত। কমিউনিজমের ভাবাদর্শে দীক্ষিত কিছু নেতৃত্বেরও এই রোগ দেখা দিয়েছিল। তাই অমিত বা তার স্রষ্টা গোপাল হালদার কোনও শিবিরে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত

ছিলেন। কারণ মানুষের মুক্তি সাধনাই তার ব্রত। সেই কমিউনিজমের মধ্যেই লক্ষ করেছিল শ্রমিক, কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত, ছাত্র সবার সম্মিলিত অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষের সংগ্রামী পথযাত্রার সম্মিলন। তার মধ্যে ভয় ছিল, যাচাই না করে কমিউনিজমে যুক্ত হয়ে যদি জাতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্রষ্টা গোপাল হালদার স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন একই কথা,—

> ''সে হল আমার বন্দীজীবন। জেলে রয়েছি, প্রেসিডেন্সিতে, বকসায়। জেলের মধ্যে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গড়ে উঠেছে, আমি তাতে যায়নি। মনে করেছি, তা হলে বুঝি জাতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া।''[৩৪]

'ত্রিদিবা'র প্রথম খণ্ড 'একদা'-য় অমিতকে রাজনৈতিক কোনও ব্যক্তিত্বরূপে দেখি না। কিন্তু শিক্ষিত, মুক্ত চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী যুবক অমিত রাজনীতি সচেতন মানুষ। দেশমাতৃকার মুক্তির আহ্বানে সে নিজেকে নিয়োজিত করতে চায়। কিন্তু কোনো মতাদর্শে সে সামগ্রিক চেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করেনি। তাই শ্রমিক, মজুর, মধ্যবিত্ত বিপ্লবী, স্বদেশি এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে সে পর্যবেক্ষণ করে সবার পরিকল্পনা এবং পাথেয়। কিন্তু ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনও পথেই সে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার দিশা খুঁজে পায় না। সবার সাহায্যে সে এগিয়ে যায়। তবুও তার অবচেতন মন আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বেল থাকে। কোন পথে আজকের মানবের অবক্ষয়ের প্রতিরোধ গড়ে ক্রমমুক্তি সম্ভব হবে। এভাবে অপ্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে সে জড়িয়ে পড়ে এবং সুনীলের সাহায্যে এগিয়ে আসায় গুপ্তচরদের নজরে পড়ে সন্দেহভাজন রূপে গ্রেপ্তার হয়। গ্রেপ্তারের মাধ্যমেই অমিত প্রত্যক্ষভাবে পেয়ে যায় বিপ্লবপন্থীর রাজটীকা। অমিতের স্রষ্টা গোপাল হালদারও 'রূপনারানের কূলে'-তে উল্লেখ করেন যে এমনই একটি প্রত্যুষে তাঁর যৌবন পেয়েছিল রাজটীকা। 'একদা'য় অমিত ছিল যে পথের সন্ধানে। সেই অমিত জেল-জীবনে অন্যান্য রাজবন্দীদের সংস্পর্শে আত্মবোধের উন্মোচনে পায় পথের দিশা। যেখানে বিভিন্ন মত বিভিন্ন পথের যাত্রীদের তীর্থভূমি গড়ে উঠেছে। যে তীর্থতে দেশ বিদেশের বিপ্লব ও সংগ্রামের কাহিনি, গল্প, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। যেখানে বন্দীজীবনে জীবন শুষ্ক হয়ে পড়েনি। বরং আত্মদীপ্তিতে, প্রখর তেজে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মহাপথের সব যাত্রীদের সহাবস্থান হয়েছে এই জেল। যা বাইরে কখনও সম্ভব হত না। তাই বিভিন্ন জনের ভিন্ন মতাদর্শের মধ্য থেকে নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে অমিতের রাজনৈতিক দর্শন স্বচ্ছতা পেয়েছে। সে সম্মিলিত পথের বাহক কমিউনিজমে আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে। যে-পথ সর্বকালের সর্বজনের

অর্থাৎ মানুষের পথ। কিন্তু অমিত কমিউনিজমকেও বাইরের ব্যবহারিক পৃথিবীতে ভারতীয়দের উপযোগী করার কথা ভাবে। বাইরে বেরিয়ে শুরু হবে তার কর্মযুদ্ধ। তাই এই জেলকে অমিত বন্দীশালা বলতে পারে না। সে মানুষকে ভালবাসে তারই প্রমাণ জেলেও সমগ্র মতাদর্শের শ্রেণির সঙ্গে তার নির্বাধ হৃদ্যতা। যাদের সংস্পর্শে সাহচর্যে অমিত স্বচ্ছ পথ পেয়েছে। তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বলল, —

> ''এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে। 'তোমাদের সবারে প্রণাম' — কে বলে বন্দিশালা? — বন্দনা যেখানে মানবাত্মার মহত্তম ভবিষ্যতের দিকে দিবারাত্রি সমুত্থিত হইল; বেদনা যেখানে সহস্র বন্ধনের মধ্যেও প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়াছে কত দীপহীন গৃহপল্লী - জনপথ? — এ যে জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়—''[৩৫]

অমিত মুক্তি পেয়ে ঘরে যাবে। কিন্তু তার মন ছটফট করে কারণ আজ আর মা নেই। সে মায়ের স্মৃতিতে হারিয়ে যায়। সেই পাঁচ বৎসর পূর্বে মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। মৃত্যুর সময় জেল কর্তৃপক্ষ তাকে কিছু জানায়নি। অমিতের মনে ভাসতে থাকে বাড়ির কথা, পাড়ার কথা, বাবা-মায়ের ও ভাই-বোনের বিভিন্ন স্মৃতি।

দীর্ঘ কারাবাসের পর অমিত আবার বাইরের পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। অমিত ঘরে এসে দেখে এই কয়েক বৎসরে অনেক কিছু বদলে গেছে। তার গৃহ-পরিবেশ, মা নেই পৃথিবীতে, বাবা প্রায় অর্ধ চেতনালুপ্ত, বোন অনু ভাই মনু বড় হয়েছে। অনু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। মনু এম.এ পাশ করেছে। অনুর স্বামী শ্যামল ছাত্র রাজনীতি করে। ম্যাস অ্যাকশনের কথা বলে। অমিত অনুভব করেছে তাদের সময়ের মতো আজ আর মন্ত্রগুপ্তির যুগ নয়। এ যুগ কর্মের, খোলাখুলি মিছিল করে কর্মীরা, ছাত্ররা। দাবি আদায়ে অ্যাসেমব্লি ঘিরে ধর্ণা দেয়। বিভিন্ন গণসংগঠনমূলক কাজ করে। মোতাহেরের কাছে জানতে পারে মজুর ও শ্রমিকরাও বসে নেই। তারাও সবার সঙ্গে পা মিলিয়ে সংগ্রামে সামিল হয়েছে। অমিত উপলব্ধি করে জনসমুদ্রে আজ যে জোয়ার এসেছে তাতে নতুন পথ উন্মোচিত হতে চলেছে। এই পথই তো ছিল অমিতের অভীষ্ট। যে পথ হবে সবার সম্মিলিত পথ, এ পথে সার্বিক মানুষের মুক্তি হবে। যুগ পাল্টেছে লাইফ মার্চেস, অর্থাৎ এগিয়ে চলার পথ প্রসারিত হয়েছে, 'কোটালের বান ডাকিতেছে আজ ইতিহাসে'। এমন দিনে অমিতও আজ আর বসে থাকতে পারে না। কারণ সে জেলে বিভিন্ন মত ও পথের

মানুষের সংস্পর্শে এসেছে। আলাপ-আলোচনায় সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই দলানুবর্তিতা লক্ষ করেছে। সব কিছুর পরও অমিত কমিউনিজমেই আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে। কারণ এখানে সর্বশ্রেণির পথ এসে মিলেছিল। শ্রমিক, কৃষক, মজুর, ছাত্র সবাইকে আহ্বান করেছিল এই মহাপথ।

অমিত মানুষকে নিয়ে মানুষের মুক্তির পথেই যাত্রা করতে চায়। তাই কমিউনিজমের পথেই এবার কর্মের পথ ভাঙতে ভাঙতে যাত্রা করেছে। এই পথেই সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সেও অংশীদার হল। বিভিন্ন সাংগঠনিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল ১৯৪৭ সালে। 'দেশীয় শাসনে শাসকের রূপই বদল হল শুধু। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার বিপ্লবীদের বৈমাতৃক দৃষ্টিতেই দেখা হল। কারণ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিল। 'একদা'-এর একটি প্রত্যুষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যেমন হয়েছিল। ঠিক সেরকমভাবেই স্বাধীন ভারতবর্ষেও অমিতের জীবনে সেই ভোরবেলার মতোই পুনরাবৃত্তি ঘটল আবার 'অন্যদিন'-এ। অন্যদিন-এর অন্তিম লগ্নের ভোরবেলায় অমিত আবার গ্রেপ্তার হল। স্বাধীন ভারতেও বিপ্লবীদের যেতে হল জেলে। ছাত্র, শ্রমিক, মজুর বিভিন্ন শ্রেণির কমিউনিজমে আস্থাশীল কর্মীদের গণহারে গ্রেপ্তার চলল। যেখানে অমিত সবাইকে নিয়ে পৌঁছল 'আর একদিন'-এ।

'আর একদিন'-এ অমিতের পরিচিত সেই লর্ড সিনহা রোডের গোয়েন্দা অফিসে সবাইকে রাখা হয়েছে। প্রবীণ এবং নবীন প্রজন্মের বিপ্লবীদের আসর বসেছে এখানে। অনেকেই এখানে অমিতের পরিচিত। তাই তাদের আলাপ আলোচনায় স্থান পেয়েছে ব্যক্তিগত থেকে রাজনৈতিক জীবন পরিক্রমার স্মৃতিচারণা। যেখানে গোপাল হালদার তুলে ধরেছেন শুধু বিপ্লবীদের নয়। তাদের ভিতরের যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষকে। আবেগ, অনুভূতি মিশ্রিত সেই বিপ্লবীদের ভেতরকার সাধারণ বেদনাবিধুর রূপকে।

এই উপন্যাসে দেখতে পাই নানা শ্রেণির সংগ্রামীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জীবনবেদনার ছবি। তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কানাই হাজরা। শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া পণ্ডিত বংশের ছেলে অধ্যাপক তপন ভট্টাচার্য। ট্রাম ধর্মঘটের মজদুর বুলকনের কথা। এরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। কানাই হাজরার স্মৃতিচারণায় উঠে আসে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠার ইতিহাস। কানাই হাজরা ছিল ভাগচাষী। এই ভাগচাষীরা জীবনের অভিজ্ঞতা ও চেতনায় বুঝতে পারে জমিদারি শোষণের রূপকে। ৪০-এর দশকে কৃষক আন্দোলন হয়, বিভিন্ন স্থানে সভা, সমিতির মাধ্যমে কৃষক সংগঠন

গড়ে ওঠে। মিছিল হয় দাবি আদায়ের জন্য। জমিদার জোতদার বিরোধী মানসিকতা গড়ে ওঠে কৃষকদের মধ্যে। কানাই হাজরা ৪২-এ কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় কর্মীরূপে যোগ দেয়। তারপর আর থেমে নেই, একের পর এক আন্দোলনে অংশ নেয় সে। কানাই হাজরার কাছে অমিত শুনে যে আজ কৃষক রমণীরাও আন্দোলনে শরিক হচ্ছে। কানাই সময়ের সঙ্গে আজ সংগ্রামী কৃষক নেতাতে পরিণত। কিন্তু স্মৃতিচারণা করতে করতেই সে বলে স্ত্রী ও মেয়ে নারায়ণীর কথা। সন্তানসম্ভবা মেয়ের চিন্তায় কানাই এর মন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার বেদনা অমিত আপন মনে অনুভব করে। কানাই হাজরার হৃদয়দর্পণেই ভেসে ওঠে বাইরের-ভেতরের তীব্র বেদনার ছবি।

শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তপন ভট্টাচার্যের বিবৃতিতে। তপন ভট্টাচার্য যাকে অমিতের ক্ষ্যাপা মনে হয়। পণ্ডিত বংশের ছেলে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক তপন ভট্টাচার্য। সে মধ্যবিত্ত সুখী জীবন উপেক্ষা করে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তপন শ্রমিকদের নিয়ে পার্টির ক্লাস খুলেছে, দেশলক্ষ্মী মিলে ধর্মঘট করে। এবং শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেছে। সে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে 'ওয়ার্কিং ক্লাস' অর্থাৎ 'শ্রমিক শ্রেণি'র অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথা। কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য অহেতুক হবে। যদি না সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পায়। সে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার দৃঢ় সংগ্রামরত সৈনিকের ভিতরে ফুটে ওঠে বাড়ির কথা। উপেক্ষিতা স্ত্রী ও সন্তানের কথা মনে হতেই তার রাজনৈতিক খোলসটি খসে পড়ে যায় অমিতের দৃষ্টিতে। অমিতের অন্তশ্চেতনায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তপনের হৃদয়বেদনার ছবি। কিন্তু তপন ভট্টাচার্য সংগ্রামের পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রমিকদের পক্ষে লড়াইয়ে নেমেছে শোষণের বিরুদ্ধে। তার কাছে আজ তাই সর্বাগ্রে সংগ্রামী সত্তাটিই বড়।

ট্রাম ইউনিয়নের মজদুর বুলকন অবাঙালি। ট্রাম মজদুররা দাবি আদায়ে লড়াই করে। তারা মানবিকতার বোধে যুদ্ধের সময় হরতাল বন্ধ রাখে। যুদ্ধ শেষ হতেই শুরু করে হরতাল। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছে তারা। কিন্তু তাদের ভাগ্য ঝুলছে ধনিক শ্রেণির হাতে। দীর্ঘ লড়াইর পথ অতিক্রম করে আজও কোনও সমাধান হয়নি। কথা বলতে বলতে কখনও বুলকন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আবার তার হৃদয় কাতর হয়ে ওঠে বাড়ির দুরবস্থার কথা স্মৃতিতে আসতেই। অসুস্থ স্ত্রী ও সন্তানদের কথা ভেবে তার মন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এখানে আরও রয়েছে নবীন প্রজন্মের সুরোর মেয়ে মঞ্জু, সবিতার বোনপো বিজয় এবং তাদের সমবয়সী আরও অনেক ছেলেমেয়েও গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের কথা। 'আর একদিন'-এ অমিতের দৃষ্টিতে উঠে এসেছে এই তরুণদের জীবন-যাত্রা। অমিত ভেবেছে এই তরুণ-তরুণীরা জীবনকে যারা হয়তো ঠিকরূপে বুঝে ওঠেনি এখনও। স্বাধীন ভারতে এই ছিল কি তাদের অদৃষ্টে। 'ত্রিদিবা'-র মূল চেতনা ব্যক্তি থেকে সমষ্টির দিকে যাত্রা। তাই এই সংগ্রামী চরিত্রগুলোকে ব্যক্তিগত গণ্ডি পেরিয়ে পথে নিয়ে এসেছেন লেখক। কিন্তু আবেগ অনুভূতি ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তারা সজীব হয়ে উঠেছে। এরা সবাই সংগ্রামী চরিত্র কিন্তু শুধু রাজনৈতিক তত্ত্বসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। তারা সময়ের অস্থির পরিস্থিতিতে জীবন সংগ্রামের পথে নেমে সম্মিলিত হয়ে পড়েছে বৃহৎ সংগ্রামের অংশীদার রূপে। মহাযাত্রার সম্মিলিত পথে ব্যক্তিগত গণ্ডি, আবেগ ও বাঁধনকে পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু অন্তরে রয়েছে বেদনায় কাতর ভাবুক এক একটি মানুষের ছবি। চরিত্রগুলোর ব্যক্তিগত হৃদয়স্পন্দনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মানবিক সাধারণ সুখ-দুঃখের দিকটি প্রস্ফুটিত হয়েছে উপন্যাসে। যা গোপাল হালদারের রচনা বৈশিষ্ট্যের অভিনবত্ব।

'ত্রিদিবা' উপন্যাসের প্রথমে দেখেছি অমিত সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী নয়। কিন্তু সে রাজনীতি সচেতন এক যুবক। দেশের বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থে দেশনায়কের (চিত্তরঞ্জনের) আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তার অন্তরাত্মা। তাই সে বিভিন্নভাবে চিন্তায় চেতনায় দেশের স্বার্থে ব্রতী হয়ে স্বদেশি, বিপ্লবী, সন্ত্রাসীদের সাহায্য করতে করতে রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। অমিতের জীবনেও ছিল মধ্যবিত্তসুলভ নানা চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে নিজেকে দেশের সেবায় বলিপ্রদত্ত হওয়ার মন্ত্র গ্রহণ করেছে। তাই সমস্ত আবেগ, অনুভূতি, ভালবাসা, পারিবারিক বন্ধন সবকিছুকে পিছনে ফেলে আত্মনিয়োগ করেছে দেশসেবায়। কিন্তু তার অন্তর্লোকে চলতে থাকে বাইরের ও ভেতরের দ্বন্দ্ব। বাবা মায়ের ভালবাসাকে সে ছলনা করে, পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব এড়িয়ে চলে। ব্রজেন্দ্রবাবুর মেয়ে সবিতাকে দেখে মনে পড়ে, এই সবিতার সঙ্গেই তার বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু সবিতা আজ আর তার কেউ নয়। সে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী। সবিতার কথা ভাবতে ভাবতে ইন্দ্রানীর চেহারা ভেসে ওঠে তার মনের দর্পণে। ইন্দ্রানীর প্রেমকেও সে অগ্রাহ্য করে চলে। বন্ধু সুহৃদ ও সুধীরার সঙ্গে সিনেমা ও চিত্র প্রদর্শনীতে যাওয়াকে উপেক্ষা করে। সে ইতিহাসের গবেষণা ভালবাসে কিন্তু আপাতত গবেষণার কথা ভাবতে পারে না। ভাল ধ্রুপদে তার মনের সহস্র দ্বার ও দেবমন্দির খুলে যায়। অ্যালিফ্যান্টার ত্রি-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়। সাতকড়ির

আলমারিতে বিভিন্ন নতুন নতুন সংস্করণের বইয়ের ভলিউম দেখে কেনার কথা ভাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মন বলে ওঠে আপাতত এইসব ভাবা বিলাসিতার নামান্তর। কারণ সাতকড়ির কাছে যা টাকা পাবে সুনীল ও দীনুকে দিতে হবে। সে দেশসেবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে। এই যুগটা সর্বস্ব নিবেদনের যুগ। অমিত হাত-পা গুটিয়ে অন্যান্যদের মত বসে থাকতে পারে না। তাই সে যুগের তাগিদে, দেশের স্বার্থে, মানুষের মুক্তির পথে সংগ্রামে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু তার আত্মজিজ্ঞাসায় বারবার প্রতিফলিত হয় জীবনকে অস্বীকৃতির বেদনাও। সে যুগে অনেক তরুণ-তরুণীরা স্বেচ্ছায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য বলিপ্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু নিজেকে আত্মনিগ্রহ ও বঞ্চনা করায় তারাও যে দগ্ধ হত তারও সাধারণ বিশ্বাসযোগ্য বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে ত্রিদিবায়। কারণ মানুষ যেকোনো পরিস্থিতিতেই আবেগকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে যন্ত্র হয়ে যেতে পারে না।

যারা মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করে সর্বস্ব বিপ্লবের কাছে সঁপে দিয়েছিল। কিন্তু পরিবারের কথা, ভাবনা তাদের বেদনাবিহ্বল করে তোলে। এই মানবিক দ্বিধা দ্বন্দ্বের দিকটিই প্রস্ফুটিত করে দিয়েছিলেন গোপাল হালদার 'ত্রিদিবা'য়। যার ফলে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সময়ের স্বাক্ষর শুধু বিবরণমাত্র হয়ে থাকেনি। বরং সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও সংগ্রামী জীবন যন্ত্রণার দ্বন্দ্বের বাস্তব জীবনের রূপ শৈল্পিক প্রতিবেদনে সজীবতা পেয়েছে। গোপাল হালদারের বিষয়বিন্যাসে, উপস্থাপন রীতির সামঞ্জস্যে শিল্পের নান্দনিক তাৎপর্য সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে এখানে।

ত্রিদিবা উপন্যাসে আভাসে ইঙ্গিতে কয়েকটি প্রেমের কাহিনিও তাৎক্ষণিকভাবে উঠে এসেছে। এরা হল জ্যোতির্ময় ও মিনতী, সবিতা ও মনু, ইন্দ্রানী এবং অমিত নিজেই। জ্যোতির্ময় এবং মিনতীর বিপ্লবের পথেই কাছে আসা। কিন্তু যখন তারা দুজনেই নিজের মধ্যে প্রেমের স্পন্দন অনুভব করেছে। তখনই আরও কঠোরভাবে দুজনেই দুজন থেকে মুখ ফিরিয়েছে। কারণ তারা জানে, তাদের জীবন দেশোদ্ধারের ব্রতে উদ্‌যাপিত হবে। অমিত অবলোকন করেছে সংগ্রামী জীবনের সেই কঠোর সাধনাকে। যেখানে তারা নিজের প্রেম-প্রত্যাশা সবই ত্যাগ করে চলে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় জ্যোতির্ময় অমিতকে কিছু বলার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অমিত ভাবে সে হয়ত মিনতীর কথা বলবে। কিন্তু জ্যোতি শুধু বিপ্লব ও রাজনীতির কথাই আলোচনা করল। মিনতীর কথা একবারও বলেনি। অমিতের মন বলেছে, জ্যোতি যা বলেছে তা হয়ত তার মনে থাকবে না। কিন্তু না বলা কথাটাই মনে থাকবে বেশি। জেল থেকে বেরোনোর

পর অমিত সবিতা ও মনুর মধ্যেও অনুভব করেছে না বলা প্রেমের বাণী। মনু সংসার প্রতিপালনের দায়িত্বে টিউশন করে, পলিসির এজেন্টশিপ নিয়েছে। সে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করেনি। সবিতা ও মনু একই সঙ্গে পড়াশোনার ফলে দুজনে বেশি সংস্পর্শে এসেছে। তাদের অজান্তেই নিজেদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে প্রেম। কিন্তু সবিতাও নিজের জীবন যুক্ত করেছে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে। ইন্দ্রানী এবং অমিতের মধ্যেও ছিল প্রেমের একটু অনুভূতি। অমিত যাকে তার নিয়তি মেনে নিয়েছে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ইন্দ্রানী অমিতকে পথেই আবিষ্কার করে। ইন্দ্রানী এবং অমিতের রাজনৈতিক মতামতে, ভাবনায় অনেক তফাত রয়েছে। কিন্তু দু'জন দুজনকে বুঝতেও পারে ভালো করেই। কেউ কারো পথে বাধা হয় না। ইন্দ্রানী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। যদিও অমিতের কাছে ইন্দ্রানীর এই স্বাতন্ত্র্য আত্মসর্বস্ব। অমিত তাকে বলে সে বিচ্ছিন্ন। আর অমিত স্বতন্ত্র হয়েও পথের মহাসমারোহে সম্মিলিত যাত্রাতে বিশ্বাসী। ইন্দ্রানী অমিতকে বরমাল্য দিয়ে তাই পথেই গ্রহণ করেছে। ইন্দ্রানী বন্ধন চায় না। সে শুধু অন্তরেই অমিতকে প্রেমের স্বীকৃতি দিয়েছে। অমিত তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেও সে যায় না। সে বলে পথের অভিযাত্রী অমিতকে সে পথেই গ্রহণ করবে।

এই কাহিনিগুলিতে লেখক তরুণ বয়সের প্রেম অনুভূতির সত্যকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ মানবিক জীবনের এই গোপন সত্যটি কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। যদিও বহির্জীবনে সচেতনভাবে কর্তব্যপথে সবাই জীবনের সর্বস্ব ত্যাগের মহিমাদীপ্ত মূর্তি। কিন্তু ত্যাগের দীক্ষা নিয়েও প্রেম-অনুভূতির গভীর সত্যটি অন্তরে দীপ্যমান থাকে। জীবনের সহজাত চাওয়া-পাওয়াকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। এবং নারী-পুরুষের দ্বৈত মিলনেই জীবনের চালিকা শক্তির বাহক। এই অন্তরসত্যটি উপন্যাসে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। যার ফলে অস্থির সময়ের চলচ্ছবির বিবৃতির মধ্যেও চরিত্রগুলো সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

'একদা'-এর সময় এবং বিষয়বস্তুতে দেখেছি সেখানে রয়েছে স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব। আমরা দেখেছি অমিতের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণে নানা সংগঠনের অভ্যন্তরীণ আত্মম্ভরিতা, উগ্র আদর্শবাদের সীমাবদ্ধতা, বিভিন্ন দুর্বলতা। অমিত দেখেছে সুনীল মণীশদের সন্ত্রাসবাদে উন্মত্ত আত্মবিলোপ, মোতাহের দীনুদের উগ্রতা, মতান্ধতা। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে থেকে এদের সে শুধু সমালোচনা করেনি। অমিত ঝুঁকি নিয়েছে জীবনের। তাদের ভালবেসেছে, গ্রহণ করেছে। দেশ ও জনের বৃহত্তর স্বার্থে সেও কিছু করতে চায়। তাই যেন সচেতন শিক্ষিত তরুণ অমিত সর্বক্ষেত্রে বিচরণের মধ্য দিয়ে নিরীক্ষণ করে পরিস্থিতির।

নিরীক্ষণের মাধ্যমে অমিতের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে বাস্তব তা অমিতের অন্তরকে আঘাত দেয়। অমিতের অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত বাস্তবই 'ত্রিদিবা'-এর অন্তর্বাস্তব। অমিত দেখেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে দেশের বৃহত্তর তরুণ সমাজ। এই যুগ কর্মের যুগ, নিজের আত্মবলিদান দিতেই হবে। কিন্তু আত্মসচেতন সমাজসচেতন আত্মজিজ্ঞাসু সমগ্রের সাধকের অন্তরাত্মা প্রশ্ন করেছে। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কী? সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমেই কি দেশ পাবে প্রকৃষ্ট পথের সন্ধান, করতে পারবে কি স্বাধীনতা অর্জন। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উগ্র মতান্ধতায়, সীমাবদ্ধতায় কি বিপ্লব দীর্ঘায়ু লাভ করবে। অমিত এদের প্রচেষ্টা প্রয়াসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না কিন্তু সে জানে তাদের সীমাবদ্ধতাকে। তা হল এরা উগ্র মতাদর্শ ও আত্মম্ভরিতায় প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থকে বুঝতে চায় না। এর ফলে এদের শক্তি খণ্ডিত হয়ে দুর্বলতর হচ্ছে। সুনীলদের দল যেমন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, মোতাহেররা মহৎ উদ্দেশ্যের পথের বিপ্রতীপে দলের মধ্যেই আটকে পড়ছে। অমিত বুঝেছে আজ মহামানবের বৃহৎ স্বার্থে বৃহৎ সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরকার। তার জন্য সমস্ত শক্তিকেন্দ্রগুলোকে একত্রিত মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে। অমিত বোঝাতে চায় তাদের, সবাইকে সংগ্রামে ডাক দিতে চায়।

'ত্রিদিবা' ত্রিশের দশকের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে লেখা। কিন্তু লেখকের প্রতিসত্তা অমিত চরিত্রের গভীর আত্মানুধ্যানে, বিচার-বিশ্লেষণের দিকগুলির মাধ্যমেই অন্তর্বাস্তবের রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'একদা' গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৩৩ সালের একটি দিন। এই সালের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে। বিশ্বজুড়ে রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যার প্রভাব পড়েছিল অখণ্ড ভারতবর্ষে। এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা শ্রমিক আন্দোলনে ও বস্তুবাদী অর্থনীতির বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন। ফলে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামগুলোর অর্থনীতি ভাঙতে শুরু করল। আর ধনিকতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের বিকাশ এবং মানবতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল ক্ষমতাশীল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। যাকে গোপাল হালদারের সৃষ্ট প্রতিসত্তা অমিত বলেছে 'Last stage of capitalism'। যার ফলস্বরূপ সামন্ততন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিলোপ হয়নি। ভাঙাগড়ার এই সময়ে গভীর প্রোথিত শিকড়ের এই দুটো স্তর অতিক্রম করে নস্যাৎ না হলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। সেদিনের বুদ্ধিজীবী শ্রেণির কিছু উদার শিক্ষিত তরুণ এই তাত্ত্বিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা

এবং সঠিক পথ অবলম্বনের তাড়না তাদের মধ্যে জেগে উঠেছিল। এর ফলে বিপ্লবীরা শ্রমিক, মজুর সবার যৌথ উদ্যোগ চেয়ে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিল কংগ্রেস। মত, আদর্শ ভিন্ন হওয়ায় শ্রমিক মজুররা এই সংগ্রামে যোগ দেয়নি। আন্দোলনের পথে মতবিরোধী বিচ্ছিন্নতা নিজেদের মধ্যেই শত্রুতা সৃষ্টি করে জাতীয় শক্তিকে খর্ব করছিল। এই সূক্ষ্ম দিকগুলি নজর এড়ায়নি সচেতন সংগ্রামী গোপাল হালদারের। জনবিচ্ছিন্ন পথ এবং খণ্ডিত চেতনার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেননি। তার ফলেই অমিতের চেতনার দৃষ্টিতে তুলে ধরেন এর প্রতিরূপ। অমিত উপলব্ধি করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে প্রথমে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করতে হবে। সর্বক্ষেত্রের শক্তিকেন্দ্রগুলোকে সংগঠিত করে সবার প্রচেষ্টায় ন্যাশনাল ফ্রন্ট গড়ে তোলার কথা। কমরেড দাশকে অমিত নিজের ভাবনার কথা বলে,—

> ‘‘ও দেশে মজুরদের এখন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্যে বিপ্লবী
> জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একটা রফা করে চললে ভাল হয়।’’[৩৬]

অমিত মোতাহের, কমরেড দাশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাদের সীমাবদ্ধতা লক্ষ করেছে। তারা ইউনিয়নকে বুর্জোয়া দালাল ও ধনিকদের হাত থেকে বাঁচাতে খুন-খারাবির অভিপ্রায় রাখে মনে। এদেশের উগ্রতা ও মতান্ধতায় অমিত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সত্যকার শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্যস্পৃহা তাদের মধ্যে নেই। তারাও অপ্রত্যক্ষভাবে আশ্রয় করে যেন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদকে। তাদের বিরোধিতা এখন সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে গিয়ে ঠেকেছে স্বদল ও স্বমত বিরোধী অন্যান্য মজুরদের উপর। যার ফলে দেশের মানবশক্তি অবক্ষয়ের পথে চলেছে। অমিত তা বুঝতে পারে। আর অমিত সংগ্রামী শক্তির অবক্ষয়ের প্রতিরোধ গড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একত্রিত গণবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অমিত সুনীল, মোতাহের, কমরেড দাশদের বোঝানোর চেষ্টা করে। এর ফলে সুনীল তাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে। মোতাহের পেটি বুর্জোয়া বলে।

একদায় আরও স্পষ্ট হচ্ছে সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর অস্বচ্ছতা। রাশিয়ার প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় বিশ্বাসী দলগুলি সমস্ত দ্বিধা সংশয় কাটিয়ে স্পষ্ট পথ এখনও স্থির করতে পারেনি। গোষ্ঠীগত ভাবনা ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ভারতীয় রাজনীতির ভিত দুর্বল করে তুলেছিল। নিজের দলের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বৈরিতা। জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সামিল হতে রাজি নয় কমরেড

দাশ। কিন্তু শ্রমিক দলের উপর থেকে স্বদলের কমরেড শরফুদ্দিনের প্রভাব বিনষ্ট করতে কংগ্রেসের সঙ্গে ডিমনস্ট্রেশান দিতে রাজি। বৃহত্তর দেশস্বার্থের পরিবর্তে গোষ্ঠীস্বার্থে তাদের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ। অমিত অনুভব করে মোতাহেরের মতো শ্রমিক নেতারা বড় নেতৃত্বের অনুশাসনকে শিরোধার্য করে চলে। নিজের বুদ্ধি-চেতনাকে সঁপে দেয় ডগমার কাছে। কমরেড দাশ-এর মতো লোকেদের মধ্যে রয়েছে সত্যনিষ্ঠার অভাব, তারা শৌখিনতার রাজনীতিতে ব্যস্ত। শৌখিন ও আধা ইনটেলেকচুয়াল ইডিওলজি ও টেকনিক নিয়ে নিজের মধ্যে তৃপ্ত। এই অগ্রগামী নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতার ফলেই গণ আন্দোলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল।

ত্রিদিবার সমকালে যে রাজনৈতিক মতবিরোধের অচলাবস্থা ছিল তাও সম্মিলিত সংগ্রামের পরিপন্থী। উপন্যাসে সামগ্রিকভাবে আলোচনায় দেখা যায় সে-সময় আইন অমান্য আন্দোলন, ডাণ্ডী অভিযান শুরু হয়েছে যা উপন্যাসে উল্লিখিত, 'তখন ডাণ্ডীর যাত্রা শুরু হইয়াছে'। একদিকে গান্ধীবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে উগ্র বিপ্লববাদ। তার মধ্য দিয়েই চলছে অমিতের পথ পরিক্রমা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া বিশ্বজুড়ে পড়েছে। কমিউনিস্টরা যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' নাম দিয়ে শ্লোগান দিয়ে চলেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেদিন কমিউনিস্টদের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছিল। তারা শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন বাস্তবের সত্যকেই বুঝেছে। আর কমিউনিস্টরা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাদের কাছে মূল শত্রু ছিল ফ্যাসিজম। তারা উপলব্ধি করেছিল ফ্যাসিবাদের নাশকতা। যদি যুদ্ধে ফ্যাসিজম জয়ী হয় তাহলে মানবসভ্যতাকে বিনাশের দ্বারে নিয়ে যাবে। এবং সমাজবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়বে। এই সত্যোপলব্ধি থেকেই তারা স্বদেশ ও বিশ্বকে মেলানোর প্রচেষ্টা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিকতাবোধ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে কমিউনিস্টরা সংকটে গিয়ে পড়ে। কারণস্বরূপ অমলেন্দু সেনগুপ্তের গ্রন্থ 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব' এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে,—

> ''জনযুদ্ধ শ্লোগান মধ্যবিত্ত মনে দাগ কাটেনি। আসলে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার উর্ধ্বে উঠে কেউই বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের স্বরূপ বিশ্লেষণে রাজী নন।''[৩৭]

ত্রিদিবার অমিতের সমর্থন গিয়ে ঠেকেছিল সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির উপর। পথ পরিক্রমায় অমিতের দৃষ্টিতে বিভিন্ন দলমতের সীমাবদ্ধতা সেদিন ধরা পড়েছিল। মানুষের প্রকৃত মুক্তিই ছিল অমিতের লক্ষ্য।

আর অমিত মানবমুক্তির আসল সত্য পথ অবলোকন করেছিল কমিউনিজমের মধ্যে। কারণ সামগ্রিক সাধনায় ব্রতী অমিত স্বদেশাত্মা ও বিশ্বাত্মাকে একসঙ্গে দেখতে চেয়েছিল। তাই তার চোখে সেদিনের কমিউনিজমই ছিল সেদিনের হিউম্যানিজম। এই উপলব্ধির ফলেই অমিত সেদিন কমিউনিস্টদের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছিল। তাই ইন্দ্রানী অমিতকে মস্কোর ক্রীতদাস, স্ট্যালিনিস্ট বলে। কিন্তু অমিত জানে তার মূল লক্ষ্য মানুষ, মানবসভ্যতা, মস্কো নয়। অমিতের সাধনা বৃহতের, সে-সময় সে উপলব্ধি করে, 'All roads lead to communism to humanism'। অমিত নিজেকেই বলে,—

> ''অমিত জানে মানুষের ইতিহাসের বক্র-তির্যক পথে আজিকার মতো করতালি পাবে না অমিত।''[৩৮]

রাজনীতি বিষয়টি অমিত বা অমিতের স্রষ্টা গোপাল হালদারের কাছে কেরিয়ার নয়, ছিল commitment, দায়বদ্ধতা দেশের ও জনতার প্রকৃত মুক্তির স্বার্থে। গোপাল হালদারের সৃষ্টি অমিত সুনীলদের মত গুপ্ত সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্ন বিপ্লবে বা মোতাহের দীনুদের মতো খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। বুদ্ধিবাদী শিক্ষিত মুক্তবুদ্ধি স্বাধীনচেতা অমিত ও তার স্রষ্টা গোপাল হালদার মানবতাবাদী। চেতনা-বুদ্ধি-কর্মের মাধ্যমে যাচাই করে যে মতবাদে আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে তা হল মার্কসিজম। কারণ মার্কসই তার কাছে সর্বকালের মানবতাবাদী। অমিতও মনুষ্যবাদী,—

> ''আর এ যুগের মনুষ্যবাদই কমিউনিজম সৃষ্টির কর্মযোগ শাস্ত্র।''[৩৯]

সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার সমষ্টিগত ভাবনার ফলেই অমিত সাম্যবাদের পথে ক্রমশ ধাবিত হয়েছে। সে চেয়েছে মানুষের ও দেশের প্রকৃত মুক্তির পথ। সেই পথ একমাত্র সম্ভব শ্রেণিবৈষম্য-শোষণপীড়িত সামন্ততন্ত্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাজব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে। এভাবেই মানবসত্তা পরিপূর্ণতার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে। সেই সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল কমিউনিজম। এই পথেই অমিত দেখে নানা মানুষের বড় 'আমির তপস্যা' এবং সেই পথ হচ্ছে —

> ''শ্রমিকের পথ, বুদ্ধিজীবীর পথ, কর্মচারীর পথ, কবিতার পথ, বিজ্ঞানের পথ, মানবতার পথ, জীবনের পথ।''[৪০]

'ত্রিদিবা'-এর 'আর একদিন'-এ ৪০ এর দশকের উত্তাল-অস্থির ভারতবর্ষের ক্রমবিবর্তনের রূপকে অমিতের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন লেখক। এখানে লেখক সেই সময়ের বাস্তব পরিস্থিতিকে সচেতনভাবে

নির্মাণ করেছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের একটি দিন 'আর একদিন'। কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হয়েছে। নিরাপত্তা আইনে বিভিন্ন সংগঠনের কমিউনিস্ট মতাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে নিজ দেশের শাসকদের হাতেও কেন বিপ্লবীদের এই দশা হল তারই বাস্তব বিবরণ খুব সন্তর্পণে তুলে ধরেছিলেন লেখক। এখানে লর্ড সিন্‌হা রোডের গোয়েন্দা অফিসে বিভিন্ন সংগ্রামী চরিত্রের স্মৃতিতে লক্ষ করি ৪০-এর দশকের গণ-আন্দোলনের ছবি। ৪০-এর দশকে পরপর কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল গোটা বাংলায়। ১৯৪০-এর জুন মাসে 'কৃষক সভা' প্রথম তেভাগার দাবি উত্থাপিত করে। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতার দাবিতে ইংরেজ বিরোধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। ১৯৪২-এ মে দিবসের ঐতিহাসিক মিছিল হয়। ১৯৪২-এ আগস্টে বিরাট গণবিদ্রোহ হয়। যা বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন নামেই পরিচিত। ১৯৪৫ সালে ট্রাম শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি সম্বলিত নয় দিনের ঐতিহাসিক ধর্মঘট। ১৯৪৬-এ কৃষক সংগঠনগুলো কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ভিত্তিতে লড়াই শুরু করে। তাদের দাবিগুলো ছিল — উৎপাদিত ফসলের দুইভাগের তিনভাগ কৃষকের হবে। ধান তুলবে জোতদারের পরিবর্তে কৃষকরা খামারে। রসিদ ছাড়া কোন ভাগ দেবে না। শতকরা সাড়ে বারো ভাগের বেশি সুদ তারা দেবে না, বাজে কোনও আদায় তারা মেনে নেবে না। মূল কথা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই জোরদার সশস্ত্র লড়াই ছিল সবরকম শোষণের বিরুদ্ধে। মূলত জোতদার ও তার রক্ষী পুলিশবাহিনীর বিরোধিতায়। এই ৪৬-এ আবার ঘটে যায় বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলো। তাই দাঙ্গার পরিবর্তে তাদের একতার শ্রেণিচেতনাই জয়ী হয়। এই সালেই ট্রাম শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ৮৭ দিনের ধর্মঘট চলে। কলকাতার পোর্ট কর্মচারীরাও এই ধর্মঘট সমর্থন করে যোগ দেয়। এই সময়ই নির্মমভাবে ১৯শে জানুয়ারি ব্রেথ ওয়েট আয়রণ কারখানায় ও ২৭ মার্চ সুতোকলে মজুরদের গুলি করা হয়। তার ফলস্বরূপ আন্দোলন আরো মারমুখী হতে শুরু করে। এই সময়সীমায় লালকেল্লায় শুরু হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশীদ আলীর বিচার। তার মুক্তির দাবিতে মুসলীম লীগের ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ প্রয়াসে শুরু হয় ধর্মঘট। গুর্খাবাহিনী আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম লাঠি চালায়। ফলস্বরূপ ছাত্র কংগ্রেস কর্মী, ট্রাম, বাস ও রিক্সাচালক ইউনিয়নগুলি প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে স্তব্ধ হয়ে যায় কলকাতা সহ তার প্রধান প্রধান জায়গার রাস্তাঘাট। ব্যাপক হারে নির্মম শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। কিন্তু

তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস এই গণ অভ্যুত্থানকে গুণ্ডাদের দাঙ্গা হাঙ্গামা বলেই মনে করে। যার প্রমাণ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্পষ্টরূপেই মন্তব্য করেন, 'কলকাতার রাস্তায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা করছে গুণ্ডারা'। এবং এই গুণ্ডা নামে অভিহিতরা ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও নেতৃবৃন্দ। যারা শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনে সমর্থন করতে পারেনি। কারণ তারা চেয়েছিল সর্বশ্রেণির আন্দোলন যা জনযুদ্ধের রূপ নেবে। আর যা সময়ের প্রবহমান গতিতে হয়েও উঠেছিল হিন্দু-মুসলিম, ছাত্র, শ্রমিক, মজুর এর মিলিত সংগ্রাম। যার প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি।

বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতের রাস্তা উতরে অবশেষে ভারত স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থে কমিউনিস্ট পার্টি এই স্বাধীনতাকে যথার্থ মানতে পারেনি সেদিন। তাদের বিবেচনায় ঠেকেছিল ইংরেজ ও কংগ্রেসের আপসের এই স্বাধীনতা প্রকৃত মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে না। বরং দেশীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে পড়বে পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের স্বার্থে। তাই 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে শ্লোগান তোলে। পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের অবসানের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবে। যার মাধ্যমে দেশে শোষণহীন সমাজবাদী রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা গঠন করা যায়। কিন্তু দেশীয় শাসকদল এইসব বিরোধের প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষিত করে। যার ফলস্বরূপ পার্টি অফিস সীল করা হয়। বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিপ্লবীদের নিরাপত্তা আইনের আওতায় গ্রেপ্তার শুরু হয়। তৎকালীন স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক অচলাবস্থা এবং দেশীয় শাসকের বৈমাতৃক আচরণেরই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ গোপাল হালদার ত্রিদিবায় প্রকাশ করেছিলেন।

গোপাল হালদার ত্রিদিবায় আরও স্পষ্ট করেছেন নারী-স্বাধীনতার স্বরূপটি। উনিশ শতকেই রেঁনেশাসের ফলে নারী-অধিকার ও স্বাধীনতার যে-অধ্যায় শুরু হয়েছিল, তারই বিকাশের স্বতন্ত্র ভাবনা চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে গোপাল হালদারের ত্রিদিবায়। ত্রিদিবায় বিভিন্ন নারী চরিত্রের প্রসঙ্গ এসেছে। এদের মধ্যে ইন্দ্রানী, সবিতা, অনু, মঞ্জু, সুরোর কথাই একটু বিস্তৃত। গোপাল হালদারের নারী-স্বাধীনতার মূল ভাবটি হল নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকটি যা প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তিত্বময়ী ইন্দ্রানীর মাধ্যমে। স্বাধীনতা আসবে নারীর জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে। ইন্দ্রানী বলেছে—

> ''জীবিকার স্বাধীনতা না পেলে জীবনেও স্বাধীনতা রূপ গ্রহণ করতে পারে না। এই অর্থশাস্ত্র মানলাম, বুঝলাম এই আমার জীবন-শাস্ত্র। তার পর দিল্লীতে

ছুটলাম নার্সের ট্রেনিং নিতে।”[৪১]

শুধু জীবিকাও নয় নারীর সামাজিক অন্বয়ের কথাও স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ অবগুণ্ঠনের আড়ালে থাকা গৃহবন্দী নারীরা যতদিন সমাজের সঙ্গে যুক্ত হবে না ততদিন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শৃঙ্খলমোচন সম্ভব হবে না। তারই ভাব স্পষ্ট হয় সুরো ও সবিতার চরিত্রে। সুরোর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। শুধুই সংসার, সম্পদ হৃদয়হীন আভিজাত্যে তার নারীসত্তা পীড়িত হয়। তার মনে ভাবনা আসে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। কিন্তু পেরে ওঠে না। কারণ সে গৃহিণী এই কথা কীভাবে অস্বীকার করবে। সবিতা সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। সে সদা ছিল সনাতন ভারতীয় ধর্ম ও আদর্শে দীক্ষিত, সংকুচিত। কিন্তু রাজনৈতিক ঝড়ে তার মধ্যেও বিবর্তন এসেছে। সে মহিলা কলেজে পড়েছে। এর ফলে ঘর থেকে বাইরে পৃথিবীর সংঘাতে পুরনো মূল্যবোধ থেকে নতুন জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। একসময় গান্ধী আদর্শে উদ্বুদ্ধ সবিতা কিছু স্বার্থান্বেষী কংগ্রেস কর্মীদের কাজকর্মে লক্ষ করেছে যান্ত্রিকতা। গ্রামোদ্যোগ ও বুনিয়াদি শিক্ষার কাজে যুক্ত হয়ে সে অনুভব করেছে, এটা আসলে আফিম খাওয়ানোর সামিল একটা প্রক্রিয়ামাত্র। রাজনীতির ঘূর্ণিতে আঘাতে সবিতার বিশ্বাস জন্মেছে মনু ও অমিতের মত ও পথে। যে-পথ তার মতে ‘বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ’। সবিতা মনুকে অন্তরাসনে বসিয়েছে প্রেমের বেদীতে। কারণ সমস্ত সংকোচ অতিক্রম করে সে নতুন মূল্যবোধে নিজের সংস্কার ও লজ্জাকে মুছতে পেরেছে। তাই অমিত অনুভব করে সবিতার এই স্বীকৃতিকে।

> ‘‘সেই ভালবাসাকে সে স্বীকার করিল আজ; কিন্তু স্বীকার করিবে এই পৃথিবীর কর্মোদ্যোগের মাঝখানে। স্বীকার করিবে তাহা মহৎ জীবনের পাথেয় রূপে, সহজ জীবনের উপকরণ রূপে নয়।”[৪২]

নারীর জীবন শুধু বিবাহের শৃঙ্খলে বা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। লেখকের অভিপ্রায় ছিল মানুষের মুক্তি, যে মানুষ নারী-পুরুষের সহযাত্রায় সম্পূর্ণতা পাবে। নারী বিবাহ, প্রেম স্বীকার করেও কর্মোদ্যোগে হবে পুরুষের সহযাত্রী ও সহকর্মী। তাই সবিতা, ইন্দ্রানী, অনু-মঞ্জু প্রেম-বিবাহকে অঙ্গীকার করেছে কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মোদ্যোগের পথেই। আর্থিক স্বাধীনতার প্রশ্নে গোপাল হালদারের নারী চরিত্রগুলোর বিকাশ ঘটেছে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সব নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে তাঁর রচনায়। ইন্দ্রানী সমস্ত আভিজাত্য ছেড়ে নিজস্ব কর্মোদ্যোগে নিয়েছে নার্সের বৃত্তি। মঞ্জুর শিক্ষিকা শোভা

রায় স্কুলে চাকরি নিয়েছে। নিম্নবিত্ত কর্মীরা যেমন মঙলী, পার্বতীর মতো অনেক মহিলা কল-কারখানায় কাজ করে অর্থ উপার্জনের পথ প্রশস্ত করেছে। মহাসময়ের পরিবর্তনের ধাপে ধাপে গোপাল হালদারের নারী চরিত্রগুলোও বিকশিত হয়েছে। গোপাল হালদার নারী-স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপটি উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিলেন তাঁর রচনায়। যেহেতু নারীও মহামানবের অংশ। মানবতাবাদী লেখক অখণ্ড চেতনার সম্মিলনে নারীর বৃহৎ শক্তিকেও যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। নারী প্রগতি, নারীশক্তি এবং নারীর ব্যক্তিক মর্যাদার রূপচিত্র অঙ্কন হয়েছে ত্রিদিবায়। এবং তা একদিনেই হয়নি; এই পরিবর্তনও এসেছে অস্থির মহাকালের ঘূর্ণিময় বাতাবরণে। তারই রূপচিত্র ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন।

ত্রিদিবায় কিছু শব্দ এবং কাব্যিক ভাষার সমাহার ঘটেছে। যা লেখকের মূল বক্তব্যকে আভাসে-ইঙ্গিতে দ্যুতিময় করে তুলেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংগ্রামী পথে প্রেরণাদায়ী শব্দগুলো অনেক বেশি ব্যঞ্জনাধর্মীও বোধ হয়। যেমন - 'লাইফ মার্চেস', 'ম্যাস এ্যাকশন'। লাইফ মার্চেস অর্থাৎ যা ইঙ্গিত করে একটি গতিময় জীবনযাত্রার। ম্যাস এ্যাকশন যা গণ আন্দোলনকে দ্যোতিত করে। জীবনের চিন্তায়-চেতনায় অমিত যে বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তারই ঝঙ্কার এই শব্দ প্রয়োগে উঠে আসে। যা লেখকেরও ছিল অভিপ্রেত। 'প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা', 'ইনটেন্স লিভিং', 'ম্যান দ্য মেকার', 'নিস্তব্ধ রাত্রি', 'সুন্দর প্রভাত', 'ভোরের আলো', 'বুড়োদের কাজ', 'নিউ জেনারেশন', সকলের চোখে মুখে, বুকে সেই মানব সম্পূর্ণতার দীপশিখা'। ত্রিদিবায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছগুলোর মধ্যে গোটা উপন্যাসের ভাববস্তু বিবৃত হয়েছে যেন। বিপ্লবী, সংগ্রামী সমস্ত লোকের প্রত্যাশায় ঝুঁকিপূর্ণ ঘাত-সংঘাতের দিন যাপন হয়েছে। এই প্রত্যাশা ছিল জীবনত্যাগের পরিবর্তে স্বাধীনতা, মুক্তি। এই প্রতীক্ষায় রাত্রি-দিন ত্যাগের পথে ব্রত উদযাপিত করেছে সংগ্রামীরা সবাই। নিস্তব্ধ রাত্রির অবসানে ভোরের আলোতে জীবনের স্বাধীন পথ প্রসারিত হবে নতুন উদ্যমে এই প্রত্যাশা নিয়ে।

ত্রিদিবার সামগ্রিক আলোচনায় বিধৃত হয় সাধারণ-অসাধারণ বিপ্লবী ও সংগ্রামীদের রক্তঝরা ইতিহাস। মহাসময়ের এমন এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি যার মূলে আছে সমগ্র সাধারণ শ্রেণির আত্মত্যাগের ইতিহাস। লেখকের অন্তশ্চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে বাস্তবের অন্তর্নিহিত মূল সারসংক্ষেপ। স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব, সংগ্রামী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত। ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টিগত জীবনধারায় ক্ষত-বিক্ষত অন্তরের ছবি ও দ্বন্দ্ব। যথার্থ স্বাধীনতার স্বরূপটি অর্থাৎ লেখকের প্রত্যাশিত মানবমুক্তির পথেই যে সার্বিক মুক্তি, তারই প্রতিধ্বনি বারবার ধ্বনিত হয়েছে লেখকের প্রতিসত্তা অমিতের পথ সন্ধানে, মতাদর্শ যাচাইয়ে।

বিভিন্ন দল ও দলানুবর্তিতা খণ্ডিত চেতনার বোধ সামগ্রিক স্বাধীনতার পথকে খর্ব করেছিল। এই মূল অন্তর্নিহিত সত্যটিই উদ্ঘাটিত হয়েছে লেখকের বক্তব্যে, বিশ্লেষণে এবং গভীর অন্তশ্চেতনার ধ্যান ধারণায়। যার ফল দেশীয় শাসকদের হাতে দেশের দায়িত্বভার এসেছিল ঠিক। ভারত স্বাধীনও হয়েছিল কিন্তু বৃহত্তর জনস্বার্থ সেখানে স্থান পায়নি। এই বিপ্লবপন্থীদের স্বাধীন ভারতেও স্থান হল জেলে যেখানে ত্রিদিবা শেষ হয়েছে। তবুও এখানে সাধারণ মানুষের মুখচ্ছবির মধ্যেই রয়েছে মহামানবের সম্পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি, সৃষ্টির স্বাক্ষর। তাই লেখক শেষে প্রতিটি অস্তিত্বের জানান দিয়ে বলেন, —

> ''এক একটি দিনের মধ্যে — প্রতিটি এই সাধারণ দিনের মধ্যেও — ইতিহাসের
> ভাবী দিন রূপায়িত, বিঘোষিত তাহার মহদাশ্বাস! 'অয়মহং ভো!' ''[৪৩]

ত্রিদিবায় রয়েছে বিস্তৃত সময় ও পরিসরের ব্যাপ্তি। আত্মসচেতন, সমাজ-সচেতন এবং রাজনৈতিক সচেতন বিশেষত ইতিহাস সচেতন লেখক গোপাল হালদার এখানে সমাজতাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ত্রিদিবার মূল সুর মানব-সত্য এবং প্রকৃত মানব মুক্তির অন্বেষণ। লেখকের সংস্থাপিত প্রতিসত্তা কেন্দ্রীয় চরিত্র অমিতের জীবন-জিজ্ঞাসায় যা বারবার প্রতিফলিত। অমিতের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং ভাবাদর্শ আসলে লেখকেরই একান্ত জীবনের জীবনবোধ। আর এই বোধকে লেখক অমিত চরিত্রের গভীর অবচেতনার মধ্যে সঞ্চালিত করেছেন। এই অবচেতনার মূলে একটি গভীর দার্শনিক মনস্কতাও উদ্ভাসিত। যা ঔপন্যাসিকতার প্রধান সঞ্চালক গতি। সেটা হল জগৎ ও জীবন, সভ্যতা, সমাজ, রাজনীতি, দেশ এবং বিশ্ব সবই সত্য ও অন্যোন্য সম্পৃক্ত। কিন্তু 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এই সুরই মুখ্য। তাই লেখকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে সমস্ত কিছুকে চাপিয়ে মানুষের সম্মিলিত পথের জয়গানই মুখ্য স্থান লাভ করে। শেষে লেখক দেখতেও পান 'ঐ মহামানব আসে'। সভ্য যুগে মানুষ সমাজেরই বিশিষ্ট ও প্রধান অঙ্গ। আর এই সমাজেই রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে বিপর্যয়ের ফলে মানুষই পদদলিত হয়। এবং শোষণকামী উপনিবেশের দ্বারা সাধারণ মানুষ লাঞ্ছিত, শোষিত হয়। যার ফলে মানবতার অবক্ষয়, অবমাননায় পৃথিবী ধ্বংসের পথে নিশ্চয় নেমে আসবে। মৌলিক অধিকার এবং প্রকৃত মানবমুক্তি ছাড়া কোনও স্বাধীনতাই তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে না। এই ভাবাদর্শই লেখক ও প্রতিসত্তা অমিত চরিত্রকে মানুষের সার্বিক ও সামগ্রিক শক্তিকে একত্রিত করার প্রয়াসে অবতীর্ণ করেছে। বিপর্যস্ত সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক আবর্তে প্রদক্ষিণ করতে করতে অমিত কমিউনিজমের মধ্যেই অবশেষে সম্মিলিত

মানবের শক্তিকে দেখতে পেয়েছে। যা অমিতের স্রষ্টা গোপাল হালদারের জীবনের একান্তই বাস্তবিক জীবনের প্রতিরূপ। আজীবন রাবীন্দ্রিক বোধ অর্থাৎ সামগ্রিকতা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন লেখক। এবং রাজনীতিতে মার্ক্সীয় মুক্তিবোধে দীক্ষিত। যেখানে তিনি অবলোকন করেছিলেন সমগ্র শ্রেণির সম্মিলিত পথকে। এই দ্বৈত বোধই লেখকের চিন্তায়, চেতনায়, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে পরিশীলিত হয়ে 'ত্রিদিবা'য় পুনর্নির্মিত হয়েছে। যা লেখক বিশ্বাস করতেন, তাকে জীবনে কর্মের মধ্যে গ্রহণও করেছিলেন। কারণ সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি তাঁর দায়বোধের উপলব্ধি তাঁকে তাড়িত করত। গোপাল হালদারের চরিত্রে, দৃঢ় ব্যক্তিত্বে প্রতিফলিত যে, শুধু সমাজতত্ত্ববিদ বা চিন্তাবীর হলেই চলবে না। সুনিশ্চিত চিন্তাধারার সঙ্গে মানুষকে হতে হবে কর্মবীর যে-কর্মে দেশ এবং দশের মুক্তি এবং উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। গোপাল হালদার চিন্তায়, চেতনায় বা মননঋদ্ধ মুক্ত রচনাসৃষ্টিতে তাঁর জীবনবোধকে শুধু উন্মোচিত করেননি। বিপ্লবী কর্মীরূপে কর্মের পথে নিরলসভাবে তাকে প্রয়োগও করে গেছেন। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্র অমিত বার বার উপলব্ধি করে 'This is the age of Action.' — এটা কর্মের যুগ। ত্রিদিবায় প্রতিফলিত হয়েছে সার্বিক মুক্তির কথা যে-মুক্তি নারী পুরুষ নির্বিশেষে কাম্য, যে-মুক্তিতে রক্ষিত হবে মানুষের সাম্য এবং অর্থনৈতিক অধিকার। আর তার সম্ভাবনা লেখক লক্ষ করেছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী নীতিতে। ত্রিদিবায় অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে ইন্দ্রানী ও তপন ভট্টাচার্যের বক্তব্যে। ইন্দ্রানীর প্রতিনিধিত্বে উঠে এসেছে নারীমুক্তি এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা। ইন্দ্রানী অমিতকে বলেছে জীবিকার স্বাধীনতাই (অর্থাৎ স্বাধীন অর্থোপার্জনের) জীবনের স্বাধীনতার মূল রূপ। তপন ভট্টাচার্য শ্রমিক-মজদুরদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছে। দিন বদলের দিনে অমিত উপলব্ধি করেছে আজ আর মেয়েরাও বসে নেই। সবার বিবর্তন হয়েছে। সবিতা, ইন্দ্রানী, পার্বতী, মংলী সবাই কেউ সামাজিক কর্মে, তো কেউ উপার্জনের পথে নেমেছে। আর সমাজের উন্নতিকল্পে এটাই ছিল লেখকের কাম্য। যা ত্রিদিবার মধ্যে লেখকের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে উদ্ভাসিতও হয়েছে সুন্দরভাবে।

ত্রিদিবার বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় উপন্যাসতাত্ত্বিক মিখায়েল বাখতিন কথিত যথার্থ ঔপন্যাসিকতার শর্তটিও রক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসের তিনটি পর্ব অমিত চরিত্রের তিনটি দিনের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু এটা কোনও একমুখীন বিবৃতিমূলক ভাষ্য হয়ে ওঠেনি। বরং একক ব্যক্তিসত্তা অমিতের পরিমণ্ডলে বেষ্টিত রয়েছে অসংখ্য ব্যক্তিসত্তা। অমিতের চিন্তাস্রোতের বহিশ্চেতনায় এবং অন্তশ্চেতনায় তাদের

সমান্তরাল গতি অব্যাহত রয়েছে শেষ পর্যন্ত। তাই সত্তা এককভাবে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকেনি। বরং অপর সত্তার উপস্থিতিতে দ্বিবাচনিক সত্যে উপনীত হয়েছে। অমিতের চিন্তাকে, ভাবনাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ। অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশে, খণ্ডিত ঘটনা ও চেতনার সমাবেশে উপন্যাসে বহুমাত্রিক পথ ও বহুস্বরের তাৎপর্যও দ্যোতিত হয়েছে। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত জগৎ ও জীবনের প্রতিটি চরিত্রের আন্তঃস্বর পর্যবসিত হয়েছে সামাজিক বহুস্বরে যে-স্বর সামাজিক অন্তর্ঘাতে উত্থিত, রাজনৈতিক দাবদাহে উচ্ছ্বলিত।

ত্রিদিবা রাজনৈতিক অস্থির সময়ের বাস্তব পটভূমিকে কেন্দ্র করে গ্রথিত। লেখক যেখানে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আধুনিক বঙ্গদেশের সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের রূপরেখাকে গভীর অনুধ্যানে বিবৃত করেছিলেন। মননশীল লেখকের একনিষ্ঠ অনুশীলনে উন্মোচিত হয়েছে নিগূঢ় ঐতিহাসিক সময়। এই সময়ই যেন অমিতের আরেক রূপ। সময়ই ত্রিদিবার ধারক ও বাহক। সময় গতিময়, সময় চলমান সে থেমে থাকবে না। ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ভাঙাগড়ার সময় ত্রিশের দশক। এই সময়ের চাহিদা সময়ের দাবি ছিল মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামে সর্বশক্তির সর্বস্ব নিবেদন। যদিও সময় অব্যাহত গতিময় কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্টতা আছে। কারণ সময়কে কর্মে ধারণ করতে হয়। নইলে পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। ইতিহাসে তার কোন যুগচিহ্নও থাকে না। তাই সেই উত্তাল দশকের কালক্ষণে অমিত দিশেহারা। সময় বয়ে যাচ্ছে কিন্তু কাজের গতি সংকীর্ণ গণ্ডিতে আটকে রয়েছে। তার আপ্তবাক্যে তাই বারবার প্রতিধ্বনিত হয় 'Time is out of joint, Time is out of joint'। অমিত ব্রজেন্দ্রবাবুদের কাছেও আবেদন জানায় একটা প্রজন্মকে বলি দিতে। নইলে সময় তার গতিতে বয়ে যাবে। এবং পড়ে থাকবে মুক্তিকাঙ্ক্ষী দেশবাসীর হাহাকার। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন নিজদেশে পরবাসীর অভিশাপমোচন কখনও সম্ভব হবে না। সময়েরই প্রতীক রূপে প্রথমেই 'ঘড়ি' ও 'বাস' এর ব্যবহার লক্ষণীয়। ঘড়ি যা সময়ের নির্দিষ্টতার পরিমাপক। এবং বাস যা গতিময়তার পরিচায়ক। ঘড়ির মাধ্যমে যেন দিন বদলের, সময় বদলের আভাস লেখক দিতে চান। আর বাস যার যাত্রা পেছনের সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে শুধু সামনের দিকে যাত্রা। এবং যাত্রীদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেবার বাহক। এই সংকেতগুলোর মধ্যেই যেন লেখকের অব্যক্ত মূল অন্তর্বাস্তবের রূপটি ক্রমশ ফুটে ওঠে। ত্রিদিবায় লেখক লিরিকধর্মী ভাষার ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং উপমার ব্যবহার তাঁর বক্তব্যের চেয়েও অনেক বেশি ব্যঞ্জনাধর্মী ও ইঙ্গিতবাহী। আর এই ধরনের ভাষার ব্যবহারে অস্থির দাবদাহপূর্ণ ঘটনার মধ্যেও

উপন্যাসে নতুন নান্দনিক মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের রচনানৈপুণ্যে প্রতিবেদনটি কাব্যিক ভাব ও মেজাজে দুরূহতাকে ভেদ করে সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে। মানুষ প্রকৃতিরই সন্তান, তাই প্রাকৃতিক উপমায় আভাসিত হয় মানুষের অন্তর্লোকের গভীর সত্যটি। মানুষের অন্তর্লোকের সেই পরিচয়কে বহন করেছে লেখকের ব্যবহৃত শব্দ এবং উপন্যাসের পর্বগুলোতে আভাসিত হয়েছে লেখকের মূল অভিব্যক্তি। সুনীল ও মণীশের প্রসঙ্গে এসেছে —

> ''ত্রয়োদশীর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দুইজনের দেখা ... পরমুহূর্তেই সমস্ত দীপ্তি নিবিয়া গেল যেন ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে নাই, শরতের শ্রী ঝরিয়া গিয়াছে।''[৪৪]

এখানে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুনীলকে ত্রয়োদশীর চাঁদ রূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসী বন্ধু মণীশের সংস্পর্শে পথনির্দেশে সুনীলের বিবর্তনের রূপটি প্রস্ফুটিত করেছেন লেখক। সুনীলের জীবনের করুণ পরিণতিকে শরতের শ্রী ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

> ''আরও একদিন চলিয়া গেল সুনীলের মুখ মেঘাচ্ছন্ন দার্জিলিঙের ম্লান আকাশের মত।''[৪৫]

ত্রিদিবায় এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন — 'সকালের রৌদ্রালোক' (পৃঃ ৮), 'আজ সুন্দর প্রভাত – শীতের রৌদ্রভরা পথ আজ' (পৃঃ ৩০), 'অমিতের চোখে পড়িল ভোরের আলো আসিতেছে' (পৃঃ ১৩১)। 'অন্ধকার সরাইয়া নতুন দিনের বাতায়ন খুলিতেছে' (পৃঃ ১৩১), 'প্রাঙ্গণ পার হইয়া শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রভাত আকাশের প্রথম দূত' (পৃঃ ১৩৭)। 'রাত্রিশেষের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে কারখানার বাঁশির ডাকে কারখানার মানুষ' (পৃঃ ৩৪২), 'নিস্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর দিয়া সবুট পদধ্বনি আগাইয়া আসিল' (পৃঃ ৩৪৭)। 'বাংলাদেশের বুকে নিজেদের সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া দিয়া বর্ষণ শেষ শুভ্র মেঘ পাহাড় বাহিয়া উঠিয়াছে' (পৃঃ ৪৮)।

ত্রিদিবার শেষে 'আর একদিন'-এর অন্তিমে উপসংহারহীন কিন্তু লেখকের অভীপ্সিত সেই পথ। মানব সম্পূর্ণতার সম্ভাবনাময় পথের প্রসারতা লেখক দেখতে পান —

> ''সকলের চোখে মুখে, বুকে সেই মানব সম্পূর্ণতার দীপশিখা। বিদ্যুৎগতি সমুজ্জ্বল পথ অমিতের সম্মুখে।''[৪৬]

এভাবেই প্রাকৃতিক উপমা ও ভাষার গীতিময় ব্যবহারে লেখক জীবনের অভীপ্সিত পরিণতিকে নির্দেশ করেছেন। এবং লেখকের ব্যক্ত বাস্তব প্রেক্ষাপটকে ভেদ করে তার অন্তরতন্ত্রীতে আভাসে, ইঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়েছে ঔপন্যাসিকের মূল বক্তব্য এবং উপন্যাসের অন্তর্নিহিত অন্তর্বাস্তব।

অভিজ্ঞতার বাস্তব ও অন্তর্বাস্তবের দর্পণে প্রতিবিম্বিত সময়-সমাজ-জীবনের অন্যোন্য-সম্পৃক্ত ভাবই ত্রিদিবায় প্রকাশিত হয়েছে। বাইরে-ভিতরে দুটি জীবনসত্য ত্রিদিবায় প্রকাশিত। ত্রিদিবার বহির্বাস্তবে রূপায়িত ত্রিশের দশক থেকে আটচল্লিশ পর্যন্ত সময়সীমার রাজনৈতিক বিপর্যয়। পরাধীন দেশে মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামী জীবনযাত্রা। আর অন্তর্বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে বৃহৎ বঙ্গভূমির ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সন্দর্ভ। ইতিহাসবিদ লেখক জানেন ধ্বংসের পরে নতুন সৃষ্টি, নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কিন্তু তার জন্য সর্বশ্রেণির মানুষকে নিয়ে মানুষের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করা বাঞ্ছনীয়। যা ত্রিদিবায় লেখক স্বীকৃত ইতিহাসের একটি বিবর্তনরেখা এবং প্রকৃত বাস্তবের বিবর্তনের ভিতরে ভিতরে অমিতের চেতনায়ও বিনির্মিত হয়ে চলেছে।

ত্রিদিবা যে অনন্য রীতির উপন্যাস এবং বিষয়বিন্যাসেও নতুন, এটা প্রতিবেদনের সার্বিক আলোচনায় স্পষ্ট রূপে ফুটে ওঠে। লেখক গভীর মননশীল অনুশীলনে তাঁর সমগ্র উপন্যাসগুলোতে কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক কালপর্বকে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ছয় খণ্ডে বিন্যস্ত 'ভদ্রাসন' তিন খণ্ডে 'মন্বন্তর ত্রয়ী' এবং এই নিবন্ধের আলোচ্য 'ত্রিদিবা'র মধ্যে যা পরিলক্ষিত। ত্রিদিবার প্রেক্ষাপটে এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক আবহ, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, অসংখ্য সংগ্রামী চরিত্র। তাদের জীবনযাত্রা, শ্রমিক, মজদুর, কৃষক, স্বদেশী, সন্ত্রাসী এবং নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের কার্যকলাপের টুকরো টুকরো দৃশ্যসম্ভার। প্রতিবেদনের মূল আধেয় হয়েছে একটি চরিত্রের চেতনায়, অবচেতনায় উদ্ভাসিত বিস্তৃত ১৮ বৎসরের ইতিহাসের বিবর্তনরেখা। প্রতিবেদনটিতে রাজনৈতিক দোলাচলতার মধ্যে সাধারণ মানুষের মানবিক যন্ত্রণা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ছোট বড় প্রত্যেকটি সংগ্রামী চরিত্রের রাজনৈতিক খোলসটিকে ভেদ করে লেখক সাধারণ মানুষের আত্মিক দ্বন্দ্ব ও সহজ সরল আবেগ, অনুভূতিতে পূর্ণ মানবিক রূপটিকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। সংগ্রাম জীবনের অধিকার অর্জনের, অস্তিত্ব রক্ষার অস্ত্র, সময়ের চাহিদা কিন্তু মানুষ চিরন্তন। যে-কোনো অবস্থায় পরিস্থিতিতে সে নিজেকে, সম্পূর্ণরূপে মানবিক অনুভূতিকে বর্জন করতে পারে না। এই উপন্যাসত্রয়ীতে আমরা মুখ্য রূপে কোন কাহিনিকে চিহ্নিত করতে পারি না। বা খণ্ডিত, বিক্ষিপ্ত মানুষের কাহিনিকে উপকাহিনি

বা প্রক্ষিপ্ত বলতে পারব না। যদিও অমিত মুখ্য নায়ক সূত্রধার কিন্তু সেও এখানে ছোট-বড় অসংখ্য জনের সহযাত্রী রূপেই স্থান লাভ করেছে। প্রত্যেকটি চরিত্র, ঘটনাই যেন মূল জীবনস্রোতের অংশ। তাই লেখক যে সময়টা এবং ঘটনাক্রমকে উপস্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন সে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এখানে লেখক চেতনাপ্রবাহের (stream of consciousness) রীতিটি গ্রহণ করেছেন। তাও কিন্তু নিজস্ব পদ্ধতিতে স্টাইলে একটি রূপ দিয়েছেন। এটাতে James Joyce এর ulysis এর মতো অতীতচারী রীতির পরিবর্তে ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের উপযুক্ত করে তাকে প্রয়োগ করেছিলেন। তার চেতনাস্রোতের গতি ভবিষ্যৎ-এর দিকে, সম্মুখের দিকে 'চরৈবেতি' শুধুই এগিয়ে চলার প্রেরণায় দীপ্ত। কারণ জীবন এবং সময় থেমে থাকে না অতীতের ধুপছায়ায়। প্রতিকূল-অনুকূল সব পরিস্থিতিকে অতিক্রম করেই তার যাত্রা শুধু সম্মুখের দিকে। ত্রিদিবায় লেখকের এই সহজ জীবনদর্শনটি স্পষ্ট হয়। ত্রিদিবায় তাই সময় এবং জীবন হয়ে উঠেছে অঙ্গাঙ্গীভাবে একে অপরের পরিপূরক এবং সহযাত্রী। কোনও মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না এককভাবে। ছোট বড় প্রতিটি বাস্তব অনুপুঙ্খকে আমাদের স্বীকার করতেই হয়। সত্তা এবং অপর সত্তার সহযাত্রাতেই জীবনস্রোত অব্যাহত হয়। তাই অমিত একদায় বিচ্ছিন্নভাবে ভাসতে ভাসতে 'অন্যদিন' এ অন্যান্য সহযোগী সহযাত্রীদের সঙ্গে নিজেকে পূর্ণতা দিয়েছে। এবং 'আর একদিন' এর মধ্যে অন্যান্য অসংখ্য সহকর্মীদের সঙ্গে নিজেকে মানবের সহযাত্রীরূপে আবিষ্কার করেছে। ত্রিদিবায় অমিত এবং অসংখ্য ছোট বড় চরিত্র, ঘটনা, সময় একে অন্যের অভিন্ন সহযাত্রী রূপে অংশীদার। তাই ত্রিদিবা লেখকের পরিশীলিত চিন্তাধারায় ও নতুন রীতির নিজস্ব পদ্ধতির গুণে পরিমার্জিত রূপ লাভ করেছে। প্রতিবেদনটি লেখকের উপস্থাপন রীতির কৌশলে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ও অনন্য ধারার রচনা বলে দাবি রাখতে সক্ষম। ত্রিদিবার সময় ঘটনা এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে গ্রহণ করেও এটা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামেরই স্বাক্ষর বহন করছে। তাই এর উপস্থাপনা অকৃত্রিম, কাহিনি অনন্য এবং ব্যতিক্রমী।

তথ্যসূত্র :

১। তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ, ২০১১, পৃঃ ৪১

২। তদেব, পৃঃ ৪৭

৩। গোপাল হালদার, গোপাল হালদার রচনাসমগ্র ১ম খণ্ড, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ, ২০০০, (পরিশিষ্ট অংশ), পৃঃ ৫৩১

৪। তদেব, পৃঃ ৩০৫

৫। তদেব, পৃঃ ৬১

৬। তদেব, পৃঃ ৫২৯

৭। তদেব, পৃঃ ১৩১

৮। দেবেশ রায় (সম্পাদক), গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, পরিচয়, কলকাতা-৭, ১৯৮০, পৃঃ ৭

৯। গোপাল হালদার, পার্টি কংগ্রেস সংখ্যা, কালান্তর, ১৯৮৯

১০। অমিয় ধর, গোপাল হালদার ; জীবন ও সাহিত্য, অতএব প্রকাশনী, কলকাতা-৯, গৃহীত সংস্করণ, ১৯৯২, পৃঃ ৫৭

১১। দেবেশ রায় (সম্পাদক), গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, পরিচয়, কলকাতা-৭, ১৯৮০, পৃঃ ১৫৮

১২। তদেব, পৃঃ ৩৩

১৩। গোপাল হালদার, গোপাল হালদার রচনাসমগ্র ১ম খণ্ড, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ, ২০০০, পৃঃ ৫২২

১৪। তদেব, পৃঃ ৫৫৩

১৫। তদেব, পৃঃ ১০৮

১৬। তদেব, পৃঃ ৩০

১৭। তদেব, পৃঃ ৩৭

১৮। তদেব, পৃঃ ৫৫, ৫৬

১৯। তদেব, পৃঃ ৭৬

২০। তদেব, পৃঃ ৭৬

২১। তদেব, পৃঃ ৭৯

২২। তদেব, পৃঃ ৮০

২৩। তদেব, পৃঃ ৮৫

২৪। তদেব, পৃঃ ৯০

২৫। তদেব, পৃঃ ১১১

২৬। তদেব, পৃঃ ১১৩

২৭। তদেব, পৃঃ ১৩০

২৮। তদেব, পৃঃ ২০৮

২৯। তদেব, পৃঃ ২০৯

৩০। তদেব, পৃঃ ১৪৫

৩১। তদেব, পৃঃ ১৪৮

৩২। তদেব, পৃঃ ১৪৯

৩৩। তদেব, পৃঃ ২১৭

৩৪। দেবেশ রায় (সম্পাদক), গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, পরিচয়, কলকাতা-৭, ১৯৮০, পৃঃ ৩৪

৩৫। গোপাল হালদার, গোপাল হালদার রচনাসমগ্র ১ম খণ্ড, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ, ২০০০, পৃঃ ২১৪

৩৬। তদেব, পৃঃ ৭৭

৩৭। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব, প্রতিভাস, কলকাতা-২, গৃহীত সংস্করণ, ২০০৬, পৃঃ ১৯

৩৮। গোপাল হালদার, গোপাল হালদার রচনাসমগ্র ১ম খণ্ড, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ, ২০০০, পৃঃ ২২১

৩৯। তদেব, পৃঃ ৫০৯

৪০। তদেব, পৃঃ ৫২৩

৪১। তদেব, পৃঃ ৩০১, ৩০২

৪২। তদেব, পৃঃ ৪৮৯

৪৩। তদেব, পৃঃ ৫২৪

৪৪। তদেব, পৃঃ ৩২

৪৫। তদেব, পৃঃ ৪৭

৪৬। তদেব, পৃঃ ৫২৪